আনন্দদীপ

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

প্রথম বর্ষ।। প্রথম সংখ্যা

স্বামী অভেদানন্দ দেব

সাঁইথিয়া সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

(স্থাপিত : ১৯৭০)

আনন্দদীপ

(ছাত্রাবাস প্রাক্তনীবৃন্দের মুখপত্র)

১ম বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা
২০২৩

সাঁইথিয়া
বীরভূম-৭৩১২৩৪

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীবৃন্দের কার্যকরী সমিতি
[Ececutive Committee]
২০১৮-১৯

সভাপতি (President)	:	মোহাম্মদ তাজউদ্দীন
সম্পাদক (Secretary)	:	প্রসুন কুমার ঘোষ
সহ-সভাপতি (Vice President)	:	শিবাশিস মণ্ডল, মানব যশ
সহ-সম্পাদক (Joint Secretary)	:	শোভন মুখোপাধ্যায়, অমিত্রসুদন চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	:	পলাশ ব্যানার্জী

সদস্য (Member) :

মোহাম্মদ সাদেক আলী বিশ্বাস, মহঃ মোস্তফা কামাল,
তাপস ঘোষ, গৌতম চন্দ, পিনাকী রঞ্জন ঘোষ, সুজিত দাস,
পলাশ সিনহা, সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলী

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১

সভাপতি (President)	:	মহঃ মোস্তফা কামাল
সম্পাদক (Secretary)	:	সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলী
সহ-সম্পাদক (Joint Secretary)	:	সুজিত দাস
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	:	শোভন মুখোপাধ্যায়

সদস্য (Member)

শিবাশিস মণ্ডল, পলাশ ব্যানার্জী, মানব যশ,
আব্দুল খালেক, পলাশ সিনহা, বিমল পাল, উদয়ন পাল,
কুণালকান্তি সিংহরায়, সুরজিৎ রায়

২০২১-২২

সভাপতি (President)	:	মোহাম্মদ সাদেক আলী বিশ্বাস
সম্পাদক (Secretary)	:	সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলী
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	:	শোভন মুখোপাধ্যায়

সদস্য (Member)

পলাশ সিনহা, বুবুল সরকার, তরুন সাহা, মানবেন্দ্র রায়,
শুভেন্দু মণ্ডল, মলয় দাস, স্বপন বাগদী,
সুনীত সাহা, সন্দীপ গোলদার

২০২২-২৩

সভাপতি (President)	:	মহঃ মোস্তফা কামাল
সম্পাদক (Secretary)	:	বুবুল সরকার
সহ-সম্পাদক (Joint Secretary)	:	সুনীত সাহা
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	:	মানবেন্দ্র রায়

সদস্য (Member)

আবু তাহের মাসুম রাজা, স্বপন বাগদী, বিশ্বজিৎ সাহা,
কৃষ্ণদাস লায়েক, সুব্রত কুমার সাহা, রঞ্জিত কুমার সেন,
গিরিধারী দাস, পলাশ সিনহা, সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলী,
শোভন মুখোপাধ্যায়, ভূমানন্দ সিনহা, মলয় দাস

পত্রিকা কমিটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী (Advisory Committee)	:	জলদবরণ দত্ত, শোভন মুখোপাধ্যায়, ভূমানন্দ সিনহা, সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলী, পলাশ সিনহা
সভাপতি (President)	:	মহঃ মোস্তফা কামাল
প্রকাশক (Publisher)	:	বুবুল সরকার
প্রকাশকাল	:	১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩
সম্পাদকমণ্ডলী (Editors)	:	পঙ্কজ কুমার মণ্ডল, অনিমেষ মণ্ডল, কুণালকান্তি সিংহরায়, সুরজিৎ রায়, রঞ্জিত কুমার সেন
প্রচ্ছদ (Cover)	:	কুণালকান্তি সিংহরায়, রঞ্জিত কুমার সেন শিল্পী : রাহুল সওদাগর
মুদ্রণ	:	সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান যোগাযোগ : ৭৯০৮০৫৯৯৪৭

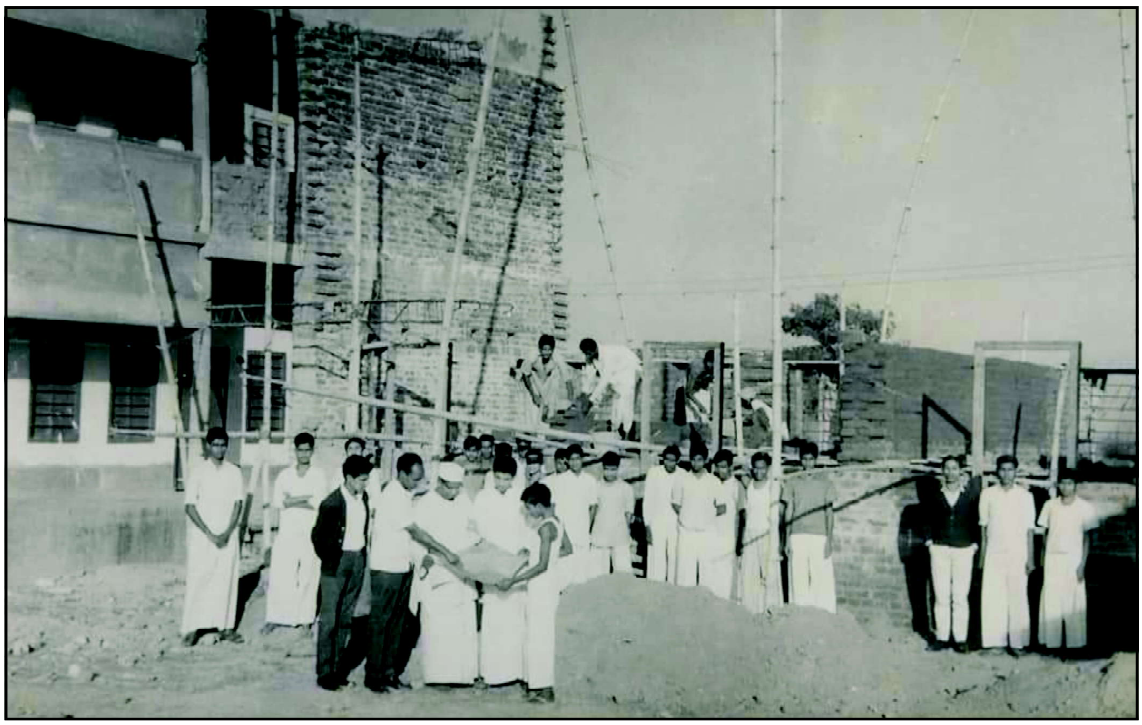

অভেদানন্দ কলেজ, তৈরির মূহূর্তে।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস।

শোকবার্তা

বিগত বৎসরগুলিতে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের যে সমস্ত প্রাক্তন আবাসিককে আমরা অকালে হারিয়েছি তাঁদের পূণ্য স্মৃতির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি—

শক্তিপদ কুইল্যা (প্রবেশ ১৯৬৬ সাল)
স্বপন সুর রায় (প্রবেশ ১৯৬৭ সাল)
মধুসুদন ঘোষ (প্রবেশ ১৯৬৭ সাল)
সহদেব দালাল (প্রবেশ ১৯৬৭ সাল)
অঞ্জন মুখার্জি (প্রবেশ ১৯৬৭ সাল)
পীযুষ ভট্টাচার্য (প্রবেশ ১৯৬৭ সাল)
নিকুঞ্জ বিহারী সাহা (প্রবেশ ১৯৬৭ সাল)
সুভাষ ঘোষ (প্রবেশ ১৯৬৮ সাল)
প্রলয় কুমার দাস (প্রবেশ ১৯৭৫ সাল)
আব্দুল গফফর (প্রবেশ ১৯৭৭ সাল)
মোহাম্মদ তাজউদ্দিন (প্রবেশ ১৯৭৮ সাল)
শিশির কুমার দাস (প্রবেশ ১৯৭৯ সাল)
সোমনাথ কর্মকার (প্রবেশ ১৯৭৯ সাল)
দ্বিজেন সাহু (প্রবেশ ১৯৮০ সাল)
সুখেন সাহা (প্রবেশ ১৯৮১ সাল)
সুশান্ত রায় (প্রবেশ ১৯৮১ সাল)
শুভেন্দু দাস (প্রবেশ ১৯৮৩ সাল)
অনন্ত ভট্টাচার্য (প্রবেশ ১৯৮৩ সাল)
শান্তিরাম পাল (প্রবেশ ১৯৮৩ সাল)
নজরুল ইসলাম (প্রবেশ ১৯৮৪ সাল)
কল্পতরু ঘোষ (প্রবেশ ১৯৮৫ সাল)
ধনঞ্জয় মণ্ডল (প্রবেশ ১৯৮৫ সাল)
জয়দীপ মণ্ডল (প্রবেশ ১৯৮৫ সাল)
পার্থ মজুমদার (প্রবেশ ১৯৮৬ সাল)
গৌতম মণ্ডল (প্রবেশ ১৯৯৩ সাল)
প্রণবেন্দু মণ্ডল (প্রবেশ ১৯৯৪ সাল)
হিমাদ্রি হাজরা (প্রবেশ ২০০১ সাল)
নিয়াজুল খান (প্রবেশ ২০০৪ সাল)
সুবীর সিনহা (প্রবেশ ২০০৪ সাল)
অপূর্ব মণ্ডল (প্রবেশ ২০০৪ সাল)
দীনেশ লেট (প্রবেশ ২০১৯ সাল)

উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে যাঁদের নাম এই তালিকায় রাখতে পারলাম না আজ এই পূনর্মিলন উৎসবের প্রতিটি মুহূর্তে তোমরাও আছো আমাদের মধ্যেই। আমাদের হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসায় তোমাদের গভীর উপস্থিতি অমলিন হয়ে থাকবে চিরদিন।

সূচিপত্রে

কার্যকরী সমিতির সম্পাদকের কলমে		৯
কার্যকরী সমিতির সভাপতির কলমে		১০
সম্পাদকীয়র পরিবর্তে...		১১

নিবন্ধ

শ্রী মিহির কুমার চন্দ্র	ঠাকুর সত্যানন্দদেব	১৩
শ্রী ভাস্কর কুমার কয়ড়ী	সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের দিনগুলি	১৭
শ্রী বিজয় কুমার দাস	কিছু স্মৃতি, কিছু কথা	২০

স্মৃতির আলোয়

জলদবরণ দত্ত	আমি—ডঃ কে ডি রায়—কলেজ—হোস্টেল	২৩
রজত কুমার ব্যানার্জী	অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সত্যানন্দ ছাত্রাবাস ও কিছু স্মৃতি	২৫
তুষার মজুমদার	সোনালী স্মৃতি	২৮
দেবদুলাল দাস	আমার হোস্টেল, আমার জীবন গড়ার কারিগর	২৯
সাদেক আলী বিশ্বাস	ফুল-সুন্দর হও	৩১
কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়	স্মৃতি শুধু বেদনারই নয়, মধুরও বটে	৩৪
সন্দীপ দাস	স্মৃতিমেদুর	৩৭
তুষার মণ্ডল	ভালবাসার ছাত্রাবাস	৩৯
শেখর মজুমদার	সত্যানন্দ ছাত্রাবাস—এক অসমাপ্ত কাহিনী	৪০
অনিমেষ মণ্ডল	এক অখণ্ড অবিরাম শক্তিময় স্রোতধারা	৪২
সুমন চক্রবর্তী	সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, সেবাপরায়ণতা এবং এক প্রকৃত পূজার নিদর্শন	৪৫
তরুন সাহা	সত্যানন্দ ছাত্রাবাস—এক ক্রিকেট ক্যাপ্টেনের কলমে	৪৭
বুবুল সরকার	দুই ইনিংসের কাহিনী	৫০
মানবেন্দ্র রায়		৫১
. Sandeep Golder	Hostel Anecdotes	৫৩
বিষ্ণু চরণ পাল	সেই রাত এবং স্মৃতি	৫৪
কৌশিক ভট্টাচার্য	যেখানে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়	৫৬

বিজ্ঞানের অন্বেষণ

Haranath Ghosh	Superconductivity for non-experts	৫৮
Kalyan Mitra	Artificial intelligence and my visit to home	৬০
Md. Mossaroff Hossain	Moon and Chandrayan-3, India's Latest Lunar Mission	৬২

প্রবন্ধ

পলাশ ব্যানার্জী	র‍্যাগিং—ফিরে দেখা	৬৬
কুণালকান্তি সিংহরায়	কান্দি মহকুমার বিরলতম বিষ্ণুমূর্তি : একটি অনুসন্ধান	৬৯
পলাশ সিনহা	পরিবর্তনের ধর্ম ও ধর্মের পরিবর্তন	৭৫
রঞ্জিত কুমার সেন	ফিরে দেখা—পরাধীনতার দু'শো বছর ও বর্তমান সমাজ	৭৭

কবিতা ও ছড়ার কারসাজি

সাগর কুমার দাস	প্রেম	৮১
মোহাম্মদ সাদউদ্দিন	আমি খুঁজে বেড়াই	৮১
পঙ্কজ কুমার মণ্ডল	সহরাই	৮২
চঞ্চল রায়চৌধুরী	অন্ধ জাগো	৮৩
তাপস সাহা	পুরানো সেই সিনের কথা	৮৪
বিমল চৌধুরী	সহবাস	৮৫
অনিরুদ্ধ দাস	সুচেতনা	৮৫
ওয়াকিফ মোহাম্মদ সাহিন	উদাসীন সময়	৮৬
আবু তাহের মাসুম রাজা	নামকরণ	৮৬
জহুরুল ইসলাম	শুভলগ্ন	৮৭
মুরারি কৃষ্ণ সাহা	প্রণয়ের উদ্বোধন	৮৭
Hafizul Kabir	Sensation	৮৮

গল্পের সময়

কমলেশ ঘোষ	গল্প শুধু গল্পই হয়	৮৯
সুরজিৎ রায়	যখন রাতের কুয়াশারা...	৯১

প্রাক্তনীবৃন্দ ৯৪

কার্যকরী সমিতির সম্পাদকের কলমে

প্রিয় প্রাক্তনী দাদা, ভাই ও বন্ধুরা,

আমরা যারা সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে থেকেছি, তারা এখান থেকেই প্রথম পেয়েছি আনন্দে সবার সঙ্গে আনন্দ করার শিক্ষা এবং অন্যের দুঃখে বিপদে পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা। আজ এই ছাত্রাবাসের প্রাক্তনী হয়ে যাওয়ার অনেক দিন পরেও সেই শিক্ষা আমাদের কাছে টেনে আনে, পথ দেখায়। বিগত বছরগুলির সমস্ত কার্যকরী সমিতি (EC) এই কাজটাই করে চলেছে সাধ্যমতো।

সব কাজে, সব দায়িত্বে সাফল্য আর ব্যর্থতা পাশাপাশি থাকে। বর্তমান কার্যকরী সমিতির তরফে আমরা বিগত বছরে আমাদের অকাল-প্রয়াত প্রাক্তনীদের বাড়ি গিয়েছি তাঁর আত্মীয় পরিজনদের পাশে থাকার বার্তা দিতে। প্রাক্তনীদের আত্মীয়বিয়োগে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমাদের হোস্টেলের তরফে। স্বীকার করছি সব ক্ষেত্রে যেতে পারিনি। ফোনে খোঁজ নিয়েছি। যতদূর সম্ভব যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি এই বিরাট পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। হোস্টেলের বর্তমান আবাসিকদের অনুরোধে সরস্বতী পূজায় তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও আমাদের বিশেষ সাফল্য এটাই যে, আমরা প্রত্যেক বছর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করতে পারছি এবং সেই সূত্রে বছরে একদিন সমস্ত হোস্টেল চত্বর পরিষ্কার করতে পারছি। এই বছর ডাইনিং রুম রং করার পরিকল্পনা আছে। পাশাপাশি ব্যর্থতাও কিছু আছে। আমরা এখনো সমস্ত প্রাক্তনীকে আমাদের অনুষ্ঠানে সামিল করতে পারিনি। যোগাযোগের চেষ্টা চলছে, আগামী দিনেও চলবে। আমরা গোটা হোস্টেল রং করার এবং হোস্টেলে একটা ইংলিশ টয়লেট করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। কিন্তু নানান কারণে এগুলোও করে উঠতে পারিনি এ বছর। আগামীর পরিকল্পনায় এগুলোও থাকবে।

আসলে, সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের কার্যকরী সমিতি মানে দু'জন, দশজন, বা তিরিশজন মানুষ নয়। কার্যকরী সমিতির মধ্যে আমরা সবাই আছি। এ কোনো ব্যবসায়িক বা লাভজনক সংস্থা নয়, তাই এর পদাধিকারীরাও কোনো সুবিধাভোগী নয়। সবাই সবার কাছাকাছি থাকা আর ভালো থাকাটাই এখানে সবচেয়ে বড় কথা। এখানে আমরা আছি, তাই আমি আছি। কার্যকরী সমিতির সম্পাদকের কলমে এ আমাদের সবার লেখা।

আমার মনে পড়ে 'চরৈবেতি' দেওয়াল পত্রিকার কথা। তখন সময় ছিল জীবনে এগিয়ে চলার। বিভিন্ন সময়ে একে একে এসেছিলাম সবাই। তারপর বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছি। এখন জীবনের স্থির সমুদ্রে যদি শুধু একটা দীপ জ্বালাতে পারি তবে সেটাই হবে অনেক। তারই তাগিদে আমাদের সবার এই সম্মিলিত প্রয়াস 'আনন্দদীপ', আমাদের পত্রিকা, আমাদের ভাব প্রকাশের নিজস্ব জায়গা।

কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার একটা লাইন দিয়ে শেষ করব—

'আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'

বুবুল সরকার

কার্যকরী সমিতির সভাপতির কলমে

১৯৮৩ সাল মাধ্যমিক পাশ করার পর দাদা (ইফতেখার হোসেন) আমাকে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করে। সেই সুবাদে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের আবাসিক হই। বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, প্রত্যন্ত গ্রামের লাজুক গোবেচারা ধর্মভীরু ছেলে ছিলাম। দাদা তখন সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় বর্ষের আবাসিক। আমি একদিন এক সকালে ছাত্রাবাসে গেলাম। ১৩নং রুমে আমার এক সহপাঠীর সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হল। আমার রুমমেট সুব্রত চৌধুরী চোস্ত ছেলে। আমার থেকে সর্ববিষয়ে এগিয়ে। রাত্রে যথারীতি দাদাদের সঙ্গে মধুর পরিচয় পর্ব হল। যত দিন গেল সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। দীর্ঘ পাঁচ বছর একে অন্যের পাশে থেকে এইভাবে পড়াশোনা খেলাধুলা করে আনন্দে কাটালাম। পেলাম সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার আনন্দ, নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা, সকল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

প্রিয় ছাত্রাবাস ছাড়ার পর এক-আধ বছর যাতায়াত থাকলেও আস্তে আস্তে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখনকার অনুন্নত প্রযুক্তিগত কারনে। এর অনেক পরে কিরীটি ব্যানার্জী, অরূপ দত্ত এবং আরও কয়েকজনের প্রচেষ্টায় প্রিয় ছাত্রাবাসের WhatsApp গ্রুপ হয়। এর মাধ্যমে আবার সকলের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আসে। কয়েক জনের একনিষ্ঠ প্রয়াসে, পলাশ ব্যানার্জীর নেতৃত্ব ২০১৮-তে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীদের জমজমাট পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হয় সাঁইথিয়ার একটি অনুষ্ঠান ভবনে। সে দিনটা আমাদের সকলের একটা স্মরণীয় দিন। এখানে আমরা কী কী গঠনমূলক কাজকর্ম কীভাবে করতে পারি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিটি গঠন করা হয়। আমরা ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীরা সকলেই সমমর্যদাসম্পন্ন। কিন্তু কাজকর্মের জন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে বা নিতে হবে। তাই কমিটি গঠন আবশ্যক। যাতে আমরা সকলে একসাথে মিলিত হতে পারি, সকলের পাশে থাকতে পারি। তাই প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে পূণর্মিলন করা। এইভাবে নানা যোগাযোগের মাধ্যমে নানা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকি।

মাঝে একটা খুব খারাপ সময় গেছে। আমরা আমাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছি। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীরা এই সময়ে একে অপরের পাশে থেকেছি, সাহস যুগিয়েছি। দূরদূরান্তে আটকে পড়া আত্মীয় স্বজনদের ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা, হসপিটালে যোগাযোগ করা, আর্থিক সহায়তা, কোনো প্রাক্তনীর অর্থাভাবে চিকিৎসা বন্ধ না হয় তার ব্যবস্থা করা। এইভাবে নানা ভালো কাজে এগিয়ে এসেছে আমাদের প্রিয় ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীরা।

অনেক দিনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশে বর্তমান কমিটির আলোচনায় প্রাক্তনীদের লেখা নিয়ে একটি পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পত্রিকা কমিটি গঠন করা হয়। তাদের উদ্যোগে লেখা জোগাড় করে পত্রিকা ছাপিয়ে ডিসেম্বর ২০২৩ এর পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে সকলের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়ার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের সবার প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় 'আনন্দদীপ' সকলের মন জয় করতে সফল হবেই হবে—এই আশা রাখি।

মহঃ মোস্তফা কামাল

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে...

যে জীবন ফেলে এসেছি বহুদূরে তাকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? যাবে না। তবু মনের সেলুলয়েডে যেটুকু রূপরেখা ধরা দেবে তাই-ই বা কম কীসে! সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনের ভাসা ভাসা ছবিগুলো আবার যদি একসূত্রে গেঁথে একটা চালচিত্র তৈরি করতে পারি তবে আমরা নিজেদের সার্থক মনে করব।

একটু বিশদেই বলি তাহলে। ২০১০ কি ২০১১ সাল নাগাদ সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের কয়েকজন প্রাক্তনীর মাথায় ভূত চাপল—একবার যদি হোস্টেলে পুরনো বন্ধুদের নিয়ে সমবেত হতে পারি। যেমন বলা তেমনি কাজ। পলাশ, সুধীরঞ্জন সহ আরো কয়েকজনের তৎপরতায় আমাদের সেই ঐতিহাসিক গেট-টুগদার, যা অচিরেই রূপ নিল এক বৃহদায়তন পুনর্মিলন উৎসবের। এই উৎসব এতটাই বড় আকার ধারণ করল একসময় যে হোস্টেলের সীমা ছাড়িয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হলো ভাড়া করা অনুষ্ঠানভবনের। কিন্তু অনুষ্ঠানের জৌলুস তাতে কিছু মাত্র কমেনি। বরং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সহজ হয়েছিল বলেই সেই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ধান ভানতে এত শিবের গীত কেন?

বেশ তো চলছিল অনুষ্ঠান, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, একটা দিন হৈ চৈ করে কাটিয়ে দেওয়া। কিন্তু যে ছাত্রাবাসের নাম সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, যে ছাত্রাবাস চায় তার প্রতিটি আবাসিক হয়ে উঠবে ফুলের মতো সত্য ও সুন্দর সে কি থামতে জানে? তাই কার্যকরী সমিতির মাথায় তখন খেলছে আর এক উদ্ভাবনী প্রকল্প। এই যে এত ভাবনা, এত আয়োজন, এত অতীতচারণ সব ধরে রাখতে হবে পাতায় পাতায়। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতকে মিলিয়ে সময়কে বেঁধে ফেলতে হবে স্থানাঙ্কের একটি বিন্দুতে। কে বাঁধবে সেই ঘন্টা? সুতরাং খোঁজ খোঁজ। অবশেষে পাঁচজন অসমবয়সী প্রাক্তনীকে পাকড়াও করে চাপানো হলো গুরুদায়িত্ব।

এরপর আর উপায় কি! অতএব নেমে পড়ো ময়দানে। লেখা জোগাড় করো। দুঃসহ সময় পেরিয়ে যায় অপেক্ষাতে। লেখা আসে না। কে লিখবে! কি লিখবে! বিষয় কি? কোনও দিশা নেই। অবশেষে একদিন বাঁধ ভাঙল। সত্যানন্দের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উজ্জ্বল নক্ষত্রদের থেকে আসতে শুরু করল সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া অতীতের জলছবি। আর আমরাও আবেগে বিহ্বল হয়ে একের পর এক সাজাতে থাকলাম আমাদের দাদা, বন্ধু আর ভাইদের প্রিয় বর্ণমালা। 'আনন্দদীপ' আমাদের সেই স্বপ্নের নাম—যার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স সব ভুলে একাকার হয়ে যেতে পারি। তবু বলব আমরা একটা স্বপ্নকে রূপ দিয়েছি মাত্র। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখতে স্পর্ধা দেখিয়েছিল তৎকালীন কার্যকরী সমিতি এবং আমাদের ছোট বড় প্রায় সকল আবাসিকবৃন্দ। তাঁদের সকলের সম্পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে আমরা

হয়ত পারতাম না এই পত্রিকা প্রকাশ করতে। তাই তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

যাকে ঘিরে আমাদের এই স্বপ্ন দেখা সে আমাদের সকলের প্রিয় সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। যে ছাত্রাবাস একদিন গৌরবের মহিমায় জ্বলজ্বল করত, আজ সময়ের কষাঘাতে তাকে কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যেতে দেখে আমরা হয়ত কেউ কেউ কষ্ট পেয়েছি। করোনা-পরবর্তী সময়ে আমাদের হোস্টেল কিছুটা হলেও ম্রিয়মান হয়ে গেছে। তবু বিশ্বাস রাখি এই ছাত্রাবাস আবার তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। যে গৌরবোজ্জ্বল সময়ের হাত ধরে আমরা একদিন এখানে পদার্পণ করছিলাম তার কথাই আমাদের ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে। যে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির হাত ধরে এই কলেজ ও হোস্টেলের একদিন সূত্রপাত হয়েছিল তিনি স্বনামধন্য ডঃ কে ডি রায়, যাঁর আশ্রম জীবনের নাম স্বামী কৃষ্ণানন্দ। এই সংখ্যায় আমরা তাঁকে স্মরণ করতে পেরেছি। আবার যে মহাজীবনের নামে আমাদের ছাত্রাবাসের নামকরণ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের অন্যতম শিষ্য স্বামী সত্যানন্দদেব। আমরা এই সংখ্যায় তাঁকেও স্মরণ মনন করতে পেরেছি। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা পেয়েছি হোস্টেল প্রতিষ্ঠার একেবারে আদি লগ্নের দু-একজন অগ্রজের কলমে সেইসব দিনের প্রারম্ভিক ইতিহাস। সঙ্গে রয়েছে আরো কিছু স্মৃতিচারণ, বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ এবং অবশ্যই কিছু ছড়া কবিতা গল্প। তবুও বলব সবটা আমরা পারিনি। কিছুটা সময় ও কিছুটা অক্ষমতার কারণে হয়ত সবার কাছে আমরা পৌঁছতে পারিনি। সেটা পারলে আমাদের 'আনন্দদীপ' আরো কিছুটা পূর্ণতা পেত। আমরা এই দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েও বিশ্বাস রাখি যেটুকু কাজ আমরা করতে পেরেছি তা আমাদের সকল দাদা, ভাই ও বন্ধুদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে। আগামীতে 'আনন্দদীপ' তার সকল দোষ ত্রুটি মুক্ত করে আরো পরিণত হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আপাতত সাঁইথিয়া সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের মুকুটের আরো একটি পালক আমরা উড়িয়ে দিলাম সময়ের গর্ভে...

হে মহানুভব পাঠক, এই পালকের পুণ্য স্পর্শে যদি তোমাদের শিহরণ জাগে তাই হবে আমাদের পরম পুরস্কার।

ঠাকুর সত্যানন্দদেব

মিহির কুমার চন্দ্র
(প্রাক্তন অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়)

সত্যানন্দদেব ছিলেন ধর্ম, শিক্ষা এবং দর্শন শাস্ত্রের দিগন্ত। 'ঠাকুর আমাদের—আমরা ঠাকুরের'—এই যুগ্ম শব্দবন্ধগুলি ধ্বনিত হয়েছে, সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমকে কেন্দ্র করে, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দু-এক বছর আগে থেকে আরম্ভ করে প্রায় ২৫ বছর ধরে বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে।

সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের তথা সাঁইথিয়াবাসীর সঙ্গে ঠাকুর সত্যানন্দদেবের সম্পর্ক এবং পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সাঁইথিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করার উপলক্ষে ১৯৬৪ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ঠাকুর নিজ হাতে হোম-যজ্ঞ করেছিলেন বর্তমানে যেটা সত্যানন্দ ভবন আছে তার ঈশান কোণে। মানিকদার কাছ থেকে শোনা— ''ঠাকুর সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে গাড়ি করে স্বামী কৃষ্ণানন্দ, দুবরাজপুরের স্বামী ভূপানন্দ এঁদের নিয়ে এসেছিলেন। আর সিউড়ী থেকে সাইকেলে এসেছিলেন সুহাসদা, হিরুদা, বিমলদা, বিষুদা (পরে বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক), প্রদ্যুৎদা, তরুণদা (তখন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক) এই রকম প্রায় ১৭/১৮ জন ঠাকুরের শিষ্য বা ভক্ত।

কলেজের ভিত পুজো ১৯৬৪ সালে হলেও কলেজের পঠন-পাঠন শুরু হয় ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাস থেকে। আগস্ট মাসে ক্লাস শুরু হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আসে নভেম্বর মাসে, সেই হিসাবে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯৬৫ সালের ১১ নভেম্বর। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ঠাকুর সত্যানন্দ দেবের শিষ্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রেজিস্টার পদে ছিলেন। সেজন্য দেরিতে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে অসুবিধা হয়নি এবং সেখানেও ঠাকুরের কৃপা কাজ করেছে। আর এটাও বলা প্রয়োজন ৬৫ সাল থেকেই পদার্থবিদ্যায় অনার্স (৬ জন ছাত্র) সহ অনুমোদন, এটাও বোধ হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম। প্রথম ব্যাচের ছাত্র শক্তিপদ কুইলা পদার্থবিদ্যা অনার্সে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে, এটাও ইতিহাস। সবই ঠাকুরের কৃপা।

ঠাকুরের কথায় আসছি। অধ্যাপকদের প্রায় সকলেই (মিলনদা, তিনুদা, লালমোহনদা, চন্দ্রনাথদা, মহাদেববাবু) ঠাকুরের লকেট ধারণ করতেন। এটা আমি ১৯৭০ সালে কলেজে যোগদান করার পরেও দেখেছি। বড়দের দাদা বলে সম্বোধন করা হতো। এমনকি অনেক তরুণ সন্ন্যাসী যেমন প্রকাশ মহারাজ (স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দ) মিলনদা, তিনুদা এইভাবে কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি আমি কিছুদিন আগে বরানগর কাচের মন্দিরে (যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠাকুর সত্যানন্দদেব) একদিন থেকে এসেছি প্রকাশ মহারাজের অতিথি হিসাবে। সেই একদিনের অভিজ্ঞতা আমার মনের মণিকোঠায় অম্লান থাকবে। প্রকাশ মহারাজ আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর নিজের ঘরের পাশের ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখি ঠাকুরের কম বয়সের উজ্জ্বল একটা ছবি টাঙানো আছে; মুখ ভর্তি কালো দাড়ি, ঠিক তার নীচে যুবক ব্রহ্মচারী নিরঞ্জনদার ছবি, আমি প্রণাম করলাম। প্রকাশ মহারাজ সব ঘুরিয়ে দেখালেন। গঙ্গার ধারে যে স্থানটিতে সুহাসদাকে সৎকার করা হয়েছিল সেটাও দেখলাম। সুহাসদার ভাণ্ডারা হয়েছিল সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম।

এই বরানগর আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ কিছুদিন ছিলেন তাঁর সন্ন্যাসী সহকারীদের নিয়ে। পরে সেটা আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। কাচের মন্দির থেকে

গঙ্গার ওপারে বেলুড় মঠ পরিষ্কার দেখা যায়, গঙ্গার পাড় ধরে একটু উজানে গেলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির তার পর বাগবাজার গেলে উদ্বোধন অফিস এবং মায়ের বাড়ি মুখোমুখি। এই জায়গাতে গঙ্গার এপার-ওপার বড় পবিত্র, ভাবলে মনে রোমাঞ্চ জাগে।

ফিরে আসছি ঠাকুর সত্যানন্দদেবের কথায়। ঠাকুরের পূর্বাশ্রমের নাম সত্যব্রত; বাড়ি বীরভূম জেলার চিনপাই-এর কাছে একটা গ্রামে। সত্যানন্দ ১৯২৩ সালে কলেজের ছাত্র অবস্থাতেই দীক্ষা গ্রহণ করেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে। ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্থাৎ এম.এ পাশ করেন। তারপর নিজ গুরুদেব স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নির্দেশে কঠোর তপস্যা শুরু করেন—বীরভূম জেলার সিউড়ী পৈতৃক বাড়িতে। দীর্ঘ ১৫ বছর কাল কখনও অর্ধাহারে কখনও বা অনশনে জীবন মরণ সাধনায় রত ছিলেন। যার ফলে তাঁর জীবনধারা একেবারে তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের জীবন ধারার সঙ্গে সমাপতিত হয়েছিল।

১৯৩৯ সালে তিনি জনসমক্ষে আসেন, তখন থেকে ভক্ত সমাবেশ হয় এবং অনেকেই তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং ধর্ম দর্শন শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক আলোচনা করেন। উপনিষদের ঋষি ধারার অনুসরণে কয়েকটি পরিবারের সকলেই সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন।

বীরভূম জেলার শতাধিক নারী-পুরুষ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেছেন। তাঁর দীক্ষিত সন্ন্যাসীদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি— (১) স্বামী ভূপানন্দ (২) স্বামী কৃষ্ণানন্দ (৩) স্বামী সুরেশ্বরানন্দ (৪) অর্চনা পুরীমা (৫) গীতামা (৬) স্বামী নিত্যানন্দ (৭) স্বামী বিমলানন্দ (৮) ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (৯) স্বামী মহানন্দ।

সত্যানন্দের পিতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, রায় বাহাদুর ডেপুটি কমিশনার। ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও পুত্র ছিলেন অনাসক্ত ও উদাসীন—সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন, ফুলের মতো পবিত্র ও সুন্দর। পিতার গাড়ি থাকলেও পুত্র কলেজ যেতেন পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেল নিয়ে অথবা ট্রামে-বাসে।

ঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন একজন তাপস, একজন সাধক, সাহিত্যিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ। স্বামী অভেদানন্দজীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেছেন। জগৎ কলাণের জন্য জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে কৃপা বন্টন করেছেন মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত। শ্রীশ্রী ঠাকুর সত্যানন্দদেব একজন দেব মানব, তিনি ছিলেন আজন্ম সন্যাসী ও সিদ্ধ যোগী, বাড়িতে স্বপাকে আহার, মৌন ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন, সর্বক্ষণ তপস্যামুখী মন নিয়ে অধ্যায়ন এবং অন্যান্য কাজ করতেন।

কলকাতার বাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে বিশ্ববিদ্যালয় যেতেন। কোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং-এ দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জপ মন্ত্র, কখনো বা ক্লাসে নোট নিতে গিয়ে মা ভবতারিণীর ধ্যানে আত্মহারা থাকতেন।

দীর্ঘ সাধনার পর ১৯৩৯ সালে তিনি জনসমক্ষে আবির্ভূত হন, তখন থেকে ভক্ত সমাগম হয় এবং অনেকে তাঁর আশ্রয়ে আসেন ও দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস লাভ করেন। তখন থেকে গ্রামে গ্রামে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দান করে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম ও ভাবধারা প্রচার শুরু করেন। বীরভূম জেলায় সিউড়ী, দুবরাজপুর, বার্তিকার প্রভৃতি জায়গায় শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজির নামে মেলা প্রবর্তন করে জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের ভাবধারা ও ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি প্রচারে নেমে পড়েন। আশ্রমে পৃথক একটি মাতৃবিভাগ গঠন করে তাঁদের অভ্যুদয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির ভাবধারা প্রচারের স্থায়ী কেন্দ্র হিসাবে ১৯৪৪ সালে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী সংঘ হিসাবে রেজিস্ট্রিকৃত হয় এবং ক্রমশ ২০/২২টি কর্ম কেন্দ্রের মাধ্যমে স্কুল কলেজ, চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, রিলিফ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ আরম্ভ করেন। শুরু হয় সিউড়ি তথা বীরভূমবাসীর জনজীবনে নতুনভাবে ধর্ম, আধ্যাত্মবাদ এবং শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ভাবধারার নবজাগরণ।

কর্ম জীবনের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য জীবনের সাধনা,

জপ, ধ্যান, পূজা ও তপ্যস্যাদির প্রেরণার উৎস ছিলেন ঠাকুর সত্যানন্দ দেব। তাঁর লেখা বহুদিব্য জীবনী, নাটক, ধর্ম দর্শন, ও সঙ্গীত পুস্তকের মধ্যে 'World Philosophy', 'World ethics', 'World Psychology', 'Devine flashes', 'যুগে যুগে যাঁর আসা' ও 'যুগাচার্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে এবং দেশের বাইরেও এই বইগুলি খুব সুনাম অর্জন করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে তাঁর গুরুদেব অভেদানন্দজীর লেখা 'মরণের পারে' বইটির কথা।

তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত, সঙ্গীতজগতের এক অমূল্য সম্পদ। সংগীতের মাধ্যমে স্বদেশীয় সংস্কৃতি প্রচার ও বিশেষ করে তাঁর পরমারাধ্য দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন ভাবের প্রচার তাঁর জীবন সাধনার এক নতুন দিক। তাঁর সংগীত আকাশবাণী থেকেও প্রচারিত হতে শুনেছি বহুবার।

এই মহামানবকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বাল্যাবস্থায়। সময়টা সম্ভবত ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিক, আমার বয়স তখন এগার বছর। সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপিঠের মাঠে সারদা মেলার সময়। শীতের বিকেলে দেখি মেলা-মাঠের পূর্ব দিকে, বিভিন্ন পশরার মাঝে ঠাকুর বসে আছেন মেলা আলো করে। তাঁর দিব্যকান্তি সৌম্য মূর্তি, পক্কশ্মশ্রু গৈরিক বসন, অপরূপ দেবমূর্তি নিয়ে। শীতের বিকেলে মেলা আলো করে বসে আছেন, মেলার মধ্যমণি হয়ে। সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ ঠাকুরকে ঘিরে আছেন। এরই মাঝে বিভিন্ন ভক্তগণ তাঁকে প্রণাম করছেন। ঠাকুরের ডান পাশে একটা টেবিলের উপর কমলা লেবুর ঝুড়ি এবং একটা চকলেটের পাত্র। তিনি দুহাতে হাসি মুখে বিলি করছেন। কমলালেবু এবং চকোলেট শেষ হলে পাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে।

আমি ঠাকুরের থেকে ৪০/৫০ মিটার দূরে মাঠের মাঠখান একা দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় মিনিট পনেরো পর ঠাকুর আমার দিকে তাকালেন এবং তাঁর মাথা দু-বার উপর-নীচ করে কিছু একটা বোঝালেন। বালক অবস্থায় তখন আমি কিছুই বুঝতে পারেনি। পরে জীবনের মধ্যভাগ থেকে বুঝতে পারছি সেদিন ঠাকুর আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ঠাকুরের আশীর্বাদেই আমি আজ এই অবস্থায় আসতে পেরেছি। যাইহোক এটা আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি, এ নিয়ে আমি আর বেশি কিছু লিখতে চাই না।

বীরভূম জেলায় দুটি কলেজ যথা শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ এবং অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ঠাকুর। দুটি কলেজই খুব সুনামের সঙ্গে ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে আজও বিরাজমান। অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় আমার কর্মস্থল। এই কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগ শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছে। ঠাকুর ছিলেন বিজ্ঞানের পূজারী। ধর্ম, সংগীত, সাহিত্য, দর্শন ছিল তাঁর কর্মে। আর বিজ্ঞান ছিল তাঁর মননে।

এখানে একটা কথা বলতে চাই। শুনেছি ঠাকুর যখন সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকতেন তখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। সঙ্গে থাকতেন সত্যেনবাবু (অধ্যাপক সতেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়), স্বামী কৃষ্ণানন্দ (ড. কে. ডি রায়) আরো দু-একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ঠাকুর সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।

ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে 'সত্যানন্দ ভবন' নির্মিত হয়। ঠাকুরের জন্মতিথিতে সত্যানন্দ ভবনে হোম যাগ-যজ্ঞ সহকারে তাঁর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও সারদেশ্বরী ছাত্রাবাস এবং সত্যানন্দ ছাত্রাবাস নামে কলেজের দুটি হোস্টেল কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই তৈরি হয়েছে। ইদানিং কয়েক বছর থেকে 'সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে'র প্রাক্তন আবাসিকগণ ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে পুনর্মিলন উৎস পালন করেন সাঁইথিয়ার কোনো বড় হল ঘর ভাড়া করে। সেখানে দু-দিন ধরে দেশ এবং বিদেশে থাকা ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ছাত্রগণ পুনর্মিলন উৎসব পালন করেন।

ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত চারটি বিদ্যালয় আছে বীরভূমে। তার মধ্যে সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ এবং দুবরাজপুর শ্রীশ্রী সারদা বিদ্যাপীঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময় বিদ্যাপীঠ স্কুল হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছে কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা। সুহাসদা (স্বামী সুরেস্বরানন্দ) যখন হোস্টেলের সুপার ছিলেন তখন স্কুলের সভাপতি ছিলেন বীরভূমের জেলা শাসক এবং তিনি থাকতেন হোস্টেলেই সুহাসদার পাশের ঘরে। এ সবই কিন্তু ঠাকুর সত্যানন্দদেবের কৃপা।

ঠাকুর সত্যানন্দদেব তাঁর জীবনের শেষ দিকটায় সারদামায়ের জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে সিউড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রমে এসে উঠতেন এবং প্রায় একমাস ধরে বীরভূমের বিভিন্ন আশ্রমে ঘুরতেন। একবার সম্ভবত ১৯৬৬-৬৭ সালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। বিকেলের দিকে কোনো ট্রেনে ঠাকুরের জন্য একটা কামরা রিজার্ভ করা ছিল। কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা শোভাযাত্রা সহকারে ঠাকুরকে তুলতে গেলে দেখা যায় নির্দিষ্ট কামরাটি 'মিলিটারি' লোকেরা দখল করে আছে; ছাত্ররা কামরা খালি করার কথা বললে, ঠাকুর তাদের নিষেধ করেন। নিজের সুরক্ষিত রেল কামরা ছেড়ে ঠাকুর গাড়িতে করে কলকাতা বরানগর আশ্রমে যান।

ঠাকুরের মনটা ছিল ফুলের মতো সুন্দর। ঠাকুরের হাসিটা ছিল শিশুর হাসির মতো পবিত্র। ঠাকুরের বহু বাণীর মধ্যে একটা বাণী, মনকে খুব আকর্ষণ করে— 'ফুল-সুন্দর হও /Be like a flower'। স্বামী অভেদানন্দ ঠাকুর সত্যানন্দদেব—স্বামী কৃষ্ণানন্দ এই পরম্পরা আমাদেরকে অনেকটা উঁচুতে ধরে রাখবে।

ঠাকুরের আবির্ভাব ১৯০২ সালে এবং তিরোধান ১৯৬৯ সালের ৫ আগস্ট।

গত শতাব্দীর সিদ্ধপুরুষ—যাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে আমাদের বীরভূম জেলায়। আমরা তার জন্য ধন্য এবং গর্বিত। ঠাকুরের বাণী—

''বহু কথার বহু দোষ।
বুঝে শুনে কথা কোস।''

ঠাকুরের আরও একটা খুব মূল্যবান উক্তি—

''Not to forget that a supreme entity is always guiding and watching you.''

ঠাকুরের সংগীতের মধ্যে বহুল প্রচলিত— 'জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক রামকৃষ্ণ সারদা নাম'।

এই গান দিয়ে আমরা সাধারণত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে কোনো সভা-সমাবেশ আরম্ভ করে থাকি।

এই গান শুনে সংকর (স্বামী পূণ্যাত্মানন্দ) অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের দিনগুলি

ড. ভাস্কর কুমার কয়ড়ী
(প্রাক্তন অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়)

প্রত্যেকটি মানুষের জীবন হলো স্মৃতিসঞ্চয়নের খাতা। সময় বিশেষে সুখস্মৃতিগুলি মনের আঙিনায় প্রতিবিম্বিত হয় আবার দুঃখের দাগগুলি মনকে বেদনাহত করে। তবে সুখস্মৃতিগুলিকে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে বেদনাকে দূরে রাখলে মনে শান্তি ও আনন্দলাভ করা যায়। অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপক জীবনের সূচনাপর্বে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে আবাসিক হিসাবে দিনগুলির স্মৃতিচারণের সুযোগ করে দিয়েছে আমার প্রাক্তন প্রিয় ছাত্র অনিমেষ মণ্ডল। এজন্য তাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই।

১৯৮৪ সালের ১৪ নভেম্বর অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে এই কলেজে বাণিজ্য বিভাগের শুভ সূচনা হলো। আমি সেদিন এই কলেজে কনিষ্ঠতম শিক্ষক। ইতিপূর্বে দুবছরের স্কুল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে সাতাশ বছর বয়সে নবীনপ্রাণের উদ্দীপনায় প্রায় দুইশত কিমি দূরবর্তী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহের নিকটবর্তী একটি গ্রাম ইড়পালা থেকে এখানে আসি। নতুন কর্মস্থলের পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। ভূগোলে পড়েছিলাম—সাঁইথিয়া একটি বাণিজ্যিক শহর। এছাড়া এটি একটি 'সতীপীঠ'। এখানে সে সময় ট্রেন বা বাস যোগাযোগ ছিল খুবই সীমিত। তখনও পৌরসভা গঠিত হয়নি। জনসংখ্যার চাপ কম। মানুষের জীবনযাত্রা সরল। ব্যবহারে আন্তরিকতার ছোঁয়া।

কলেজে যোগদানের কয়েকদিন পূর্বে College Service Commission-এর Recommendation letter নিয়ে এই কলেজের সেই সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সনৎকুমার মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। জানতে পারলাম কলেজ আমাকে পেয়ে অত্যন্ত প্রীত। কারণ কলেজ ১৯৮৪ সালে বাণিজ্য বিভাগের অনুমোদন পেয়েছে, ছাত্র ভর্তি হয়ে গেছে কিন্তু কোনো অধ্যাপক না পাওয়ার জন্য ক্লাস শুরু করা যাচ্ছে না। এই সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে আমি কলেজে পড়ানো শুরু করলাম। দেখলাম ছাত্ররা খুবই অনুগত। আর সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে দাদা-ভাই-এর মতো। বয়সে অনেক প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দাদা সম্বোধন করতাম। জেনেছিলাম—এই কলেজে এইটাই রীতি। সেই সময় কলেজের আয়তন ছিল ছোট কিন্তু পারস্পরিক ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। যেটা এযুগে দুর্লভ।

সাঁইথিয়াতে আমার থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাকে ভাবতে হয়নি। জানতে পারলাম কলেজের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কলেজ করে রেখেছে। ছাত্রাবাসে থাকার আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ফলে ছাত্রদের সাথে থাকার বিষয়ে মনে কোনো সঙ্কোচ ছিল না। ছাত্রাবাসের কয়েকজন ছাত্র আমাকে কলেজ থেকে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে নিয়ে গিয়ে চিলেকোঠার ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ছাত্রদের আচরণ ও সৌজন্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার ছোট-খাটো প্রয়োজনীয় জিনিস তারাই আমার ছোট ভায়ের মতো দিয়ে গেল। ছাত্রাবাসকর্মীরা এসে আমার সাথে সৌজন্য-সাক্ষাৎ করে গেলেন। আমাকে ডাইনিং হলে যেতে হতো না—আমার রুমেই কর্মীরা দু-বেলা খাবার দিয়ে যেতেন। আমি সাড়ে পাঁচমাস এই ছাত্রাবাসে আবাসিক হিসাবে আনন্দে দিন কাটিয়েছি। কোনোদিন কোনো অস্বস্তিকর বা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি। ছাত্রদের

নিজেদের মধ্যেও কোনো অশোভন আচরণ আমার নজরে আসেনি। বরং কোনো আবাসিকের অসুবিধা সমবেতভাবে অন্যরা সমাধান করে দিয়েছে। বিশেষত কোনো ছাত্রকে টাকার অভাবে তার মিল বন্ধ করা বা বাড়ি যেতে বাধ্য করা হয়নি। শুনেছিলাম ছাত্রাবাসের 'বাবা-ফাণ্ড' থেকে আবাসিকদের প্রয়োজনে ধার বা সাহায্য দেওয়া হতো। মেস খরচের কোনো মাসের অর্থ উদ্বৃত্ত হলে তা প্রাক্তনীদের দানের মাধ্যমে এই 'বাবা-ফাণ্ড' তৈরি হয়েছিল। এই কমবয়সী কলেজ ছাত্রদের মধ্যে এইরকম মানবিক উদ্যোগ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

দোতলায় সুপাররুমে একটি বুক ব্যাঙ্ক ছাত্ররা তৈরি করেছিল প্রাক্তন আবাসিক ও অধ্যাপকদের দেওয়া বই সংগ্রহ করে। কলেজের কোনো অধ্যাপক হস্টেল সুপার থাকতেন পর্যায়ক্রমে। তিনি ছাত্রাবাসে এসে সুবিধা-অসুবিধার কথা ছাত্রদের কাছে শুনতে এবং কোনো সমস্যা থাকলে সমাধান করতেন। ছাত্রাবাসে সেই সময় একাদশ শ্রেণি থেকে স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত প্রায় ১২০ জন ছাত্র থাকত। সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে হস্টেল সুপারের উপস্থিতিতে একজন Prefect ও একজন Asst. Prefect প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে স্থির করা হতো। তখন এই কলেজে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি থেকে পড়াশুনা চলতো। এই এলাকায় সেই সময় উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজের সংখ্যা কম ছিল। বিশেষত এতো বড়ো ও নির্ভরযোগ্য ছাত্রাবাস ছিল না। অনেক দূরের মালদা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর এলাকার ছাত্ররা এখানে থেকে পড়াশুনা করতো। সেই আমলে এই কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ফিজিক্স অনার্স-এর নামজাদা কলেজ ছিল। ছাত্রাবাসে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল। বছরে একবার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হতো। যেখানে সাঁইথিয়ার যে কেউ এবং ছাত্রাবাসের আবাসিকরা অংশগ্রহণ করতো। ওই সময় প্রাক্তন আবাসিকরা এসে নতুন-পুরাতনের মেলবন্ধন ঘটাতো। সদ্যপ্রাক্তনীদের বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হতো। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা আমন্ত্রিত হতেন। আমি অনেক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ পেয়েছি।

ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা, প্যান্ডেল, অলঙ্করণ এবং অভ্যর্থনা রীতিমতো আকর্ষণীয় ছিল। অনেক বছর দেখেছি ছাত্ররা পূজকের আসনে বসে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বাগ্‌দেবীর পূজা-আরাধনা করেছে।

ছাত্রাবাসে থাকাকালীন সময়ে আমি একবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম। আবাসিক ছাত্ররা আমার সেবা-যত্ন করেছে। সেই সময় হস্টেল সুপার অধ্যাপক হরিতারণ দাস খবর পেয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ি থেকে গাওয়া ঘি-চিনি মাখানো মুড়ি, হরলিক্স এবং জ্বরের কিছু ওষুধ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এমনই আন্তরিক ব্যবহার পেয়েছি এখানে অগ্রজতুল্য সহকর্মী ও ভ্রাতৃপ্রতীম আবাসিক ছাত্রদের কাছে।

আবার পরবর্তীকালে একসময় এই অধ্যাপক হরিতারণ দাসের নিদারুণ অসুস্থতার সময় জরুরিভিত্তিক রক্তের প্রয়োজন হয়। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের একদল ছাত্র সিউড়ি ব্লাড ব্যাঙ্কে ছুটে গেছে রক্তদান করতে। বয়স ১৮ বছর না হওয়ার জন্য একজন ছাত্রের রক্ত দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে সে কান্না-কাটি করেছে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কী পর্যায়ে থাকলে এই ঘটনা ঘটতে পারে!

পরবর্তীকালে আমি দু-তিন বছর এই ছাত্রাবাসে সুপারের দায়িত্ব পালন করেছি। ছাত্রদের অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছি। ছাত্রাবাসের নতুন নতুন আবাসিকদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কর্মজীবনে অবসরের পরে এখনও তার স্মৃতি-সৌরভ অন্তরকে মোহিত করে তোলে।

আশ্রমিক ভাবধারায় এই কলেজের সূচনা হয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের জনশতবর্ষে তাঁর মন্ত্রশিষ্য স্বামী সত্যানন্দদেব ১৯৬৫ সালে ১১ নভেম্বর এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্বামী সত্যানন্দদেব ছিলেন মহাতপস্বী, সুপণ্ডিত, সুলেখক, শিক্ষা সম্প্রসারক, সর্বোপরি বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ সংঘ সংস্থাপক। কলকাতার বরাহনগরে কাঁচের মন্দির, সিউড়িতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ, দুবরাজপুরে আশ্রম ও সারদেশ্বরী বিদ্যালয়, জয়দেব, বাতিকার, ঝাড়খণ্ডে দুমকা, মধুপুর ইত্যাদি স্থানে তাঁর কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত

ছিল। তাঁর ত্যাগব্রত জীবন ও সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে সেসময় অনেক সুশিক্ষিত মানুষ তাঁর চরণে শরণ নেন এবং সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তাঁর সন্ন্যাসী সন্তান পদার্থ বিদ্যার প্রথিতযশা অধ্যাপক ও লেখক স্বামী কৃষ্ণানন্দ (ড. কে. ডি রায়) এবং বিভিন্ন বিভাগে সেবারত ছিলেন আরও কয়েকজন গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহারাজ। তাঁদের মধ্যে বাংলা বিভাগে স্বামী মহানন্দ (হীরুদা এম.এ, পিএইচ.ডি, ডি.লিট) স্বামী নীলানন্দ, (সুনীলদা, এম.এ, পি.এইচ.ডি) পদার্থবিদ্যা বিভাগে ডিমনস্ট্রেটার ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ব্যানার্জী, কোষাধ্যক্ষ স্বামী নিত্যানন্দ (মদনদা) প্রমুখ ধর্মপ্রাণগণের নিবিড় সান্নিধ্য ও সস্নেহ আচরণ আমাকে এই কলেজের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত করে। কলেজের প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে অধ্যাপনা করছেন অনেক দরদী অগ্রজ সহকর্মীর ভালোবাসা পেয়েছিলাম, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সেই ভালোবাসার ফলশ্রুতি হিসাবে আমার কর্মভূমি সাঁইথিয়া হয়ে উঠেছে স্থায়ী আবাসভূমি। ছাত্র-ছাত্রীদের এবং স্থানীয় মানুষ-জনের ভালোবাসায় এই শহরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। ২০২২ সালে অবসর গ্রহণের পরেও এই কলেজ-ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীরা আমকে স্মরণে রেখেছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করি। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক চিরদিন সুষ্ঠু ও মধুময় থাকুক—এই কামনা করি।

কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

বিজয়কুমার দাস

(প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়)

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুগামী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের শিষ্য স্বামী সত্যানন্দ দেব সাঁইথিয়া শহরে ১৯৬৫ সালে অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেন। তখন ওই এলাকায় মানুষের তেমন বসবাস ছিল না। সাঁইথিয়া শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই এলাকাটি তখন শহর থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্নই ছিল। পাশেই গড়ে উঠেছিল তাঁতিদের উদ্বাস্তু কলোনী। স্বামী কৃষ্ণানন্দ তথা ড. কে ডি রায় ছিলেন অধ্যক্ষ। শুধুমাত্র বিজ্ঞানে সাম্মানিক পড়ার সুযোগ তখন কলেজে। শুধুমাত্র ছেলেদেরই পড়ার সুযোগ। ড. কে ডি রায় বিজ্ঞান জগতের মানুষ। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর পরিচিতি সূত্রেই এই কলেজে ছাত্র ভর্তি শুরু। অবশ্য ড. রায়ও এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রথমদিকে অধিকাংশ ছাত্র আসত অন্য জেলা থেকে। বিশেষত অণ্ডাল, আসানসোল, রানিগঞ্জ, বার্ণপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে। তাদের থাকার প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ছাত্রাবাস। দুটি ছাত্রবাসের একটি সারদেশ্বরী ছাত্রাবাস এবং অন্যটি সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। সত্তর-আশির দশক পর্যন্ত দুটি ছাত্রাবাসেই আবাসিক ছিল। পরের দিকে বিভিন্ন স্থানে কলেজ চালু হওয়ার কারণই সম্ভবত বাইরের ছাত্র আসা কমে গিয়েছিল। তবে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্ররা থাকতো।

আমি তখন সাঁইথিয়া টাউন স্কুলের ছাত্র। যখন উচ্চ মাধ্যমিক দেব (তখন স্কুলেই ১১ ক্লাস পর্যন্ত চালু ছিল) তখন সত্তরের দশকের শুরু। চারিদিকে দেওয়াল লিখন। সংবাদপত্রে হত্যার কালো শিরোনাম। মনীষীদের মূর্তি ভেঙে ফেলার ঘটনা। সেই অবস্থার মধ্যেই ১৯৭১-এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি শুরু হল। আন্দোলনের গরম বাতাস তখন পৌঁছে গেছে কলেজের ছাত্রাবাসেও। হয়তো কেউ কেউ গোপনে যুক্তও হয়েছিল। এই কলেজও রক্ষা পায়নি তখন আগুন থেকে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কলেজের নথিপত্র সহ গ্রন্থাগার। কে ডি রায়ের প্রচেষ্টাতেই ঘুরে দাঁড়ানো শুরু হয়েছিল কলেজের।

অবশ্য সত্তরের চৌকাঠ ছোঁয়ার আগেই কলেজের ছাত্রাবাসের আবাসিকদের দামালপনা দেখেছিল শহরবাসী। বেশ মনে পড়ে সাঁইথিয়া রক্ষাকালীতলা মেলায় ছাত্রাবাসের সঙ্গে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের তৎকালীন যুবকদের পেশীযুদ্ধের ঘটনা। শহর জুড়ে তখন রটে গিয়েছিল, কলেজ হোস্টেলের ছেলে মানেই টেরর।

ভর্তির আবেদন করেছিলাম বাংলা সাম্মানিক নিয়ে পড়ার জন্য। কারণ মাথায় তখন ঢুকে গেছে কবিতা আর নাটকের পোকা। নির্বাচিতও হয়েছিলাম। কিন্তু পরিচিত-পরিজনরা বলল, বাংলা অনার্স নিয়ে পড়লে ‘চিড়িয়াখানায় বাঘ’ সেজে থাকার চাকরি করতে হবে। অবশেষে ‘কুইনাইন’ গেলার মতো ভাব নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগেই (পাশ কোর্স) ঢুকলাম। ছাত্রাবাস তখন পুরোদমে চালু। দামালপনার গল্প কিছুটা সীমিত। কলেজে তখন ছাত্র সংসদ ছিল না। অন্যদিকে বন্ধুরা অনেকেই ছাত্রাবাসের। সেই সূত্রে ছাত্রাবাসের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপিত হল। সুযোগ পেলেই দিনে-রাতে-ক্লাসের ফাঁকে ছাত্রাবাসে সময় কাটানো। সিনিয়র আবাসিকরা (তখন নীরেনদা, তরুণদা, লালাদা, বাবনদা, পার্থসারথি গুহর যুগ) পরম স্নেহে প্রশ্রয় দিয়েছিল। অনেক সময় আবাসিকদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে কলেজের ছাত্রাবাসের আবাসিক না হয়েও তাদের দাবির পাশেই দাঁড়িয়েছি। সেই সময়ের কলেজ ও ছাত্রাবাসের ছাত্রনেতাদের (নেতা একটু আধটু ইচ্ছা তখন কাঁধে ভর করেছিল) দাবিতেই ছাত্র-ছাত্রীদের

স্বার্থে কমিটি গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হল অধ্যক্ষের কাছে। অবশ্য এই মন্ত্রটা তখন কানে ঢুকিয়েছিল ছাত্রাবাসের সিনিয়র আবাসিকরাই। বলা দরকার, আমরা যে বছর কলেজে ঢুকলাম (১৯৭১) সেই বছরই কলেজে সহ-শিক্ষা (কো-এডুকেশন) চালু হয়েছে। অথাৎ ছাত্রীরাও পড়ার সুযোগ পেয়েছে এই কলেজে। বহু স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী এই শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। স্বভাবতই একটা 'ছাত্র সংসদ' জাতীয় কিছু গড়ে না উঠলে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি আদায় করা যাবে না। অধ্যক্ষ ড. রায় প্রতি শ্রেণির দু-জন করে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গঠন করলেন স্টুডেন্টস অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি। প্রেরণার কিন্তু ছাত্রাবাসের সিনিয়ররাই। ছাত্রাবাসে যাতায়াত বাড়ল। বহু দিন রাত্রে ছাত্রাবাসে খেয়েই বাড়ি ফিরেছি। শহরের যুবকদের সঙ্গে ছাত্রাবাসের বহিরাগত আবাসিকদের যে বিভেদের প্রাচীর ছিল, তখন থেকেই ভেঙে গেল সেই প্রাচীর। আমরা শহরের ছেলেরা নিত্য যাতায়াত শুরু করলাম ছাত্রাবাসে। ছাত্রাবাসেও নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হলো।

এই হলো প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের শুরু ১৯৮০ সালে। এই কলেজেরই গ্রন্থাগারে কর্মসূত্রে যোগ দিলাম। তখন সেই পুরনো আবাসিকরা নেই। ছড়িয়ে পড়েছে দূর দূরান্তে। কলেজের ইতিহাসেও অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। অধ্যক্ষ ড. রায়ের সঙ্গে যোগ নেই কলেজের। তিনি থাকেন কলেজের কাছেই। নিজস্ব আশ্রমে। কিন্তু গ্রন্থাগারে যুক্ত থাকার সূত্রে ছাত্রাবাসের তৎকালীন আবাসিকদের সঙ্গে গড়ে উঠল সখ্যতা। আমরা, কলেজের অধ্যাপক ও কর্মীরা প্রায়ই দল বেঁধে কয়েকজন ছাত্রাবাসে যেতাম। কখনো ছাত্রাবাসের আবাসিকদের সমস্যা শুনতে, কখনো তাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ মেটাতে। সেই সময়টাতে কলেজে কোনো স্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন না। বিভিন্ন অধ্যাপক বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বে থেকেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আবাসিকদের দাবি-দাওয়া বেড়েছে। যখন যিনিই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্বে থাকতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বলা বাহুল্য, সেই সময়ের আবাসিকদের কাছেও দারুণ ব্যবহার পেয়েছিলাম। মনে রাখার মতো। ছাত্রাবাসে আবাসিকরা বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু করল। সেটা যেন শুধু ছাত্রবাসের অনুষ্ঠান নয়—কলেজেরও অনুষ্ঠান। বিভিন্ন বছরে আবাসিকরা আমার কাছে গ্রন্থাগারে এসেই আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আবৃত্তি নির্বাচন, বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচন নিয়ে পরামর্শ নিয়ে যেত। অনুষ্ঠানের দিন সারাক্ষণ কাটাতাম ছাত্রাবাসে। বাড়ি ফিরতাম রাত্রে। ডাইনিং হলে সবার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসার আনন্দই ছিল আলাদা। আর আশ্চর্য আন্তরিক আপ্যায়ন ছিল আবাসিক ছাত্রদের। হয়তো এদের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল অনেক দুষ্ট ছেলে, বেয়াদবও হয়তো কেউ কেউ। কিন্তু তখন মনে হতো, মুখগুলো বড় নিষ্পাপ।

অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে আবাসিকদের সম্পর্ক কিন্তু চিরকালই মধুর ছিল। আমাদের কলেজে প্রথম অধ্যক্ষ ড. কে ডি রায় একটা রীতি চালু করেছিলেন। কলেজের শুরু থেকেই এটা চালু ছিল। সেটা হচ্ছে, ছাত্ররা কিন্তু কলেজের অধ্যাপকদের 'স্যার' বলতো না। তার বদলে তাঁদের 'দাদা' সম্বোধন করা হতো। যেমন লালমোহনদা, মিলনদা, তিনুদা, নীতিনদা। কলেজের অধ্যাপকরাও অধ্যক্ষকে 'স্যার' না বলে 'কেষ্টদা' বলেই ডাকতেন। স্বভাবতই ছাত্রাবাসের আবাসিকদের কাছেও কলেজের অধ্যাপকরা যতখানি 'স্যার'—তার চেয়ে অনেক বেশি 'দাদা' ছিলেন। কী আশ্চর্য মধুর সম্পর্ক! আমরাও কখনো লালমোহনবাবু, মিলনবাবু, দিনবাবু, নীতিনবাবু, ব্রহ্মবাবু বলিনি। নামের সঙ্গে 'দা' জুড়েই সম্বোধন করেছি। আমার বিশ্বাস। অন্য কোনো কলেজে এই রীতি চালু ছিল না। স্বভাবতই ছাত্রাবাসের আবাসিকদের সঙ্গে অধ্যাপকদের দাদা-ভাই-এর সম্পর্ক গড়ে উঠতো। খুব খোলামেলা ছিল সেই সম্পর্ক। শ্রদ্ধাও ছিল। আবার আন্তরিকতাও ছিল। ড. রায় তো যখন তখন, এমনকি সন্ধ্যার পরেও ছাত্রাবাসে চলে যেতেন। আবাসিকদের সঙ্গে নানা গল্প করে সময় কাটাতেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে কলেজ গড়ে উঠল। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলো। ছাত্রাবাসে আবাসিক কমল। সারদামণি ছাত্রাবাস আর সত্যানন্দ ছাত্রাবাস হারিয়ে ফেলল কোলাহল। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে কলেজের শিক্ষাকর্মীদের থাকতে দেওয়া হলো।

তবু ছাত্রাবাস আছে এখনও। বছরে একবার ছাত্রাবাসের পুরনো আবাসিকরা এসে মিলিত হয়। স্মৃতিচারণে প্রাধান্য পায় 'নানা রঙের দিনগুলি'র কথা। কলেজের কাছেই ড. কে ডি রায়ের বাসগৃহ এখন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। তাঁর জন্মদিনে আহ্বান করা হয় কলেজের প্রথম দিকের প্রাক্তনীদের। অশোকদা, রাসবিহারীদা, কাবিরাজদা, জলদদা—যতক্ষণ থাকেন শুধু ছাত্রাবাসের সেইসব দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেন। আসলে ছাত্রাবাসে যারা থেকেছেন, তাদের কাছে 'ছাত্রাবাসের জীবন' চিরকালের মধুরতম স্মৃতি হয়েই থাকে।

এখন ব্যস্ত জনপদে, স্টেসনের প্ল্যাটফর্মে, ট্রেনে কামরায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেকেই এগিয়ে এসে বলে, 'স্যার, চিনতে পারছেন?'—মনে হয়, 'কী নাম? মনে তো নাই! ছাত্র ছিল কত দিন আগে?'...তার মধ্যেই উত্তর আসে কলেজ হোস্টেলে থাকতাম। কিন্তু আর একটু পুরনো আবাসিকরা 'বিজয়দা' বলেই ডাকে। বড় মধুর সেই সম্বোধন।

আমি—ডঃ কে ডি রায়—কলেজ—হোস্টেল

জলদবরণ দত্ত
প্রবেশবর্ষ : ১৯৬৬

১৯৬৬ সালে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ইউ ই পড়া কোথায় হবে সেটার জন্যই খোঁজ খবর নিতে গিয়ে সাঁইথিয়ার অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের খোঁজ পাই। একাই চলে আসি কলেজে। অধ্যক্ষ ডঃ কে ডি রায়কে প্রথম দেখি। মার্কশিট দেখে প্রথম প্রশ্ন, 'স্ট্যান্ড করতে পারবি তো?' আমতা আমতা করে 'চেষ্টা করব' বলায় জবাব, 'চেষ্টা নয়, করতে হবে।' এক টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে বাড়ি চলে গেলাম।

১৬ আগস্ট ক্লাস শুরু। ভোরবেলার ট্রেন ধরে বাক্স-বেডিং নিয়ে কলেজ চত্বরে পৌঁছাতেই দেখি কে ডি রায় স্যার এবং আরো দুই-তিন জন আমার মতোই ছাত্র। আমাকে দেখে স্যার বলে উঠলেন, 'ঐ দ্যাখ জলদ এসে গেছে।' ওইদিন থেকেই আমি জলদবরণ হতে জলদ হয়ে গেলাম। হোস্টেলের নীচের ২ নম্বর ঘরে ঢুকেই বাম দিকে আমার স্থান হলো। ঘরে তখনো মেঝে হয়নি। দেওয়াল শুধু প্লাস্টার হয়েছে। চুনকাম বাকি। মোট পাঁচটি চৌকি। ইঁট সাজিয়ে কাঠের পাটাতন দিয়ে জিনিস পত্র রাখার ব্যবস্থা। চৌকির নিচে বাক্স রাখার ব্যবস্থা। হোস্টেলে তখন নিচে এগারোটা, দোতলায় পাঁচটা ঘর। বাথরুম পায়খানা তখনো হয়নি। সে সব কর্ম মাঠে, পুকুরে। যার খুব অসুবিধা তাকে কলেজে যেতে হবে। একটি টিউবওয়েল খাবার জলের ব্যবস্থা হিসেবে। বাইরের বারান্দায় বসে খাওয়া। একটি চালাঘরে রান্নার ব্যবস্থা। নিজেদেরকেই পরিবেশনে হাত লাগাতে হতো প্রথম প্রথম। থালা ধুয়ে নিজেদের কাছে রেখে দিতাম। ওই সময় ইউ ই ছাড়া নতুন প্রথম বর্ষ আর পুরাতন দ্বিতীয় বর্ষ (যারা ভাড়া বাড়ির হোস্টেলে থাকত) মোট ৭৫ জনকে নিয়ে হোস্টেল শুরু। লালমোহনদা সুপার হিসাবে উপরের একটি ঘরে। তিনুদা কিছুদিন লালমোহনদার ঘরে স্থান পেয়েছিলেন।

বাড়ি ছেড়ে প্রথম বাইরে থাকা। স্যারের দেখাশুনায় আমরা বাড়ির পরিবেশই পেয়েছিলাম। সকাল বেলাতেই স্যার হাজির হতেন হোস্টেলে। সঙ্গে পাঁচ-ছ'টি কুকুর। কারোর কোনো অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করে পরামর্শ দিতেন। প্রথম রাতের পরের দিন সকালে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'গত রাত্রে ঘুমের ঘোরে চৌকি হতে কে কে পড়ে গেছিস?' আমি হাত তুললাম। বাড়িতে মেঝেতে অনেকের সাথে থাকা অভ্যাস! যে-কোনো একটা ঘরে ঢুকে কারোর চৌকিতে বসে অন্যান্যদের ডেকে পাঠাতেন। কেউ বাড়ি গিয়ে কোনো খাবার জিনিষ আনলে তাকে সেই খাবার সকলের সাথে তাঁর সামনেই শেয়ার করতে হতো। মনে পড়ে, শীতকালের কোনো এক সকালে একটি ঘরের চৌকিতে একটি কুকুরকে লেপ চাপা দিয়ে রেখে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এত বেলা হলো, এ ছেলেটি এখনো ওঠেনি, একে ডেকে তুলতে হবে' এবং সে কাজ আমাকে করতে হবে। আমি ব্যাপারটি না বুঝে প্রথমে ডাকাডাকি করে না ওঠায় লেপ তুলে দেখি, কুকুরটি দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছে। এসব করার ফলে আমরা বুঝতেই পারতাম না আমরা বাড়ির পরিজন ছেড়ে বাইরে আছি।

এমনি ভাবেই দিন কাটে। হঠাৎই খবর এলো আমরা ৪র্থ সাবজেক্ট হিসাবে বায়োলোজি নিতে পারবো। শুরু হল বায়োলোজি ক্লাস। স্থানীয় তিনজন ডাক্তার এগিয়ে এলেন পড়াতে। প্র্যাকটিক্যালের জন্য আসতেন বোলপুর কলেজের ডিমনস্ট্রেটার। পরীক্ষা যত এগিয়ে আসে পড়ার চাপ তত বাড়ে। আমি আবার রাত জাগতে পারতাম না। সহপাঠীরা নাকে নস্য দিয়ে রাত জাগা অভ্যাস করালো। সেটা পরে নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

একদিন হোস্টেলে দেখি দুপুরের খাবারের সময় পেরিয়ে গেলেও ঘন্টা পড়ছে না। জানা গেল আমরা সকলে নাকি না খেয়ে হোস্টেলের খাওয়ার কোয়ালিটি নিয়ে প্রতিবাদ করছি। উদ্যোক্তা সিনিয়র দাদারা। স্যারের তখন পা ভাঙার জন্য হাঁটা চলার অসুবিধা। ওই

অবস্থাতেই স্যার হোস্টেলে এলেন। এসেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, 'হীরেন, সবাই খাব না বলেছে?' —হ্যাঁ স্যার। পরপর তিনবার একই প্রশ্ন। একই উত্তর। স্যার জানালেন একটা কমিটি হবে। তারা ঠিক করবে কি মেনু হবে। কিন্তু মাসিক চার্জ একই থাকবে। এরপর আমাদের খাওয়া হল। এখন মনে হয় হোস্টেলের সব ছেলের একতা স্যারকে মুগ্ধ করেছিল।

ইউ ই পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান পেয়েছিলাম। যাইহোক, কথা রাখতে পেরেছিলাম। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়াশুনার ব্যাপারে এবার কি সিদ্ধান্ত?' আমার অংক ভালো লাগত। বললাম, 'অংক নিয়ে যদি পড়তাম।' 'খেতে পাবি না', স্যার বললেন। আসলে অংকে অনার্স নেই। আমাকে ছাড়তে ইচ্ছুক নন তিনি। তাই এমন বলা। অর্থাৎ ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে ওই কলেজেই পড়তে হবে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। শুরু হলো পড়াশুনা।

এদিকে ওই সময় বাজারে চালের অভাব। রাতে রুটি খাবার ব্যবস্থা হোস্টেলে। স্যার জানালেন হোস্টেলে কিছু চাল দিতে পারলে ভালো হয়। গ্রাম থেকে কেউ হোস্টেলে এসেছে বেশি চাল নিয়ে। তাকে অর্থমূল্য ধরে দিয়ে সেই চাল হোস্টেলে দিয়েছিলাম একবার। আমাকে মাসে মাসে হোস্টেল চার্জ দিতে হত না। বৃত্তির টাকা এলে ওই চার্জ নেওয়া হত। এটাই ছিল হোস্টেল-ফ্রি-র নেপথ্যে। যাই হোক এটাও আমার বিশেষ দরকার ছিল।

ফিজিক্স অনার্সের ক্লাস। শিক্ষক বলতে মিলনদা, তিনুদাও ক্লাস নিতেন। বোলপুর কলেজ থেকে একজন পার্ট-টাইম করতে আসতেন। এছাড়াও স্যার ক্লাস নিতেন। লাইব্রেরিতে বই তেমন ছিল না। তাই আমরা এক একজন এক এক অথরের বই কিনেছিলাম। গরমের ছুটির আগে পক্স হওয়ায় প্রায় তিন সপ্তাহ বাড়িতে কাটাতে হয়। ওই সময় ক্যালকুলাসটা অনেকটা করেছিলাম। আমরা অনার্স পড়লেও পাস-এর বিষয়গুলোও সমান গুরুত্ব দিতাম। যার জন্য পাস-এর বিষয়গুলি যে যে শিক্ষক পড়াতেন তাদেরও আমি প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। পড়াশুনার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পিছুপা হতাম না। পার্ট-ওয়ানের ফল বের হলে দেখা গেল থিয়োরিটিক্যালে যথেষ্ট নম্বর পেলেও প্রাকটিক্যালে নম্বর কম হওয়ার জন্য আমরা প্রথম শ্রেণির বেশ নিচে থাকছি। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যাই হোক ওই বছর কেউই প্রথম শ্রেণি পায়নি।

পার্ট-টু পরীক্ষা দেবার আগেই নকশাল আন্দোলন শুরু হওয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা নৈরাজ্যের ঢেউ আমাদের কলেজেও এসে পড়েছিল। পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকির আবহাওয়ায় নিজেকে সঠিক পথে চালাতে পারার জন্য আজও আমি কোনো বিবেকের দংশনে দংশিত হই না। আমি আমার ফলে সন্তুষ্ট। পরীক্ষা শেষে স্যার বই লেখায় সাহায্যের কাজে কয়েক দিন হোস্টেলে রেখে দিলেন আমাকে এবং জানালেন এম.এস.সি ক্লাস শুরুর আগে পর্যন্ত কলেজের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের সাহায্য করার কাজে লাগতে হবে। সেই সময় স্যার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন কিছুদিনের জন্য। মাসিক ১০০ টাকা মাহিনার চাকরিতে বহাল হলাম, সঙ্গে আরো দু'জন। নতুন হোস্টেলের দোতলায় পূর্ব দিকের শেষ ঘরে থাকার ব্যবস্থা হলো।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কলেজের অফিস, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা আজও চোখের সামনে ভাসে। কলেজ বন্ধ। সি আর পি টেকওভার করেছে। শুনলাম পোড়ার কিছুদিন আগেই insurance cover করানো হয়েছে। এতে আবার ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি করা সম্ভব হবে। মাঝে মধ্যে কলেজ যাই। আর হোস্টেল ফেরা হল না। এম.এস.সি ক্লাস শুরু হওয়ার জন্য বর্ধমান চলে গেলাম। মাঝে মধ্যে আসতাম। এলে হোস্টেলেই থেকে যেতাম। পরিশেষে একটা ঘটনা উল্লেখ করে এই কলমের সমাপ্তি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের কনভোকেশন একসাথে ১৯৭৫ সালের কোনো এক সময়ে হচ্ছে। স্যার ওই কনভোকেশনে উপস্থিত। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার সুবাদে সাঁইথিয়া কলেজের যথাক্রমে অশোক দত্ত ও জলদবরণ দত্ত উপস্থিত। অনুভব করলাম, ক্রম অনুযায়ী আমাদের উপস্থিতি স্যারের গর্বের বিষয়।

আজ আমার স্যার ডঃ কে ডি রায় নেই। এত আশীর্বাদ, এত গর্বিত ইতিহাস মাথায় নিয়ে আজও আমার মাঝে মাঝে হোস্টেলে ফেরা হয়। রি-ইউনিয়নের আয়োজনে, নতুন প্রজন্মের ডাকে।

অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সত্যানন্দ ছাত্রাবাস ও কিছু স্মৃতি

রজত কুমার ব্যানার্জী

প্রবেশবর্ষ : ১৯৬৮

(অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় ও সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে থাকাকালীন দীর্ঘ সময়ের কিছু স্মৃতির সামঞ্জস্যহীন উপস্থাপন)

তখন ১৯৬৮ সাল। প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে পাস করলাম। তখন মার্কশিট ডাকযোগে আসত। ফলে মার্কশিট পেতে তিন চার দিন সময় লেগে যেত। সার্টিফিকেট আসত দুই তিন বছর পর।

মার্কশিট পাওয়ার পরে পরেই বি.এস.সি, প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার জন্য ফর্ম আনতে গেলাম সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে।

কলেজে পৌছে জানলাম, অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহাশয় (ডঃ কে ডি রায়) দোতলার কলেজ বিল্ডিং নির্মাণ কাজের তদারকি করছেন ছাদে, এখন যেটি দোতলার মেঝে। গিয়ে দেখলাম প্রখর রোদে স্যার ছাতা মাথায় কাজের তদারকি করছেন। প্রখর ব্যক্তিত্বের মানুষ, রোদের আড়ালেও যেন এক জ্বলন্ত সূর্য। সব শুনে বললেন, ''নিচে নিরঞ্জনদার কাছে গিয়ে বল ভর্তি করে নিতে।'' তখন কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি চলছিল। নিচে নিরঞ্জনদার কাছে গেলাম। দেখলাম শুভ্র বসন পরিহিত, লম্বা, ফর্সা, সুদর্শন ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নিরঞ্জনদাকে—দেখলেই মাথা নুইয়ে আসে শ্রদ্ধায়। ভর্তির কথা বললাম। একটি ফর্ম পূরণ করে দিতে বললেন। পুরণ করে জমা দিলাম। হোস্টেলের কথা বলায়, কলেজ খোলার আগের দিন বাক্স বিছানা নিয়ে চলে আসতে বললেন।

কলেজ খোলার আগের দিন হোস্টেলে এলাম। তখন হোস্টেল একটিই। দ্বিতীয়টির নির্মাণ কাজ সবে শুরু হয়েছে। হোস্টেলের নিচের তলার প্রথম দিকের ঘরগুলি ফিজিক্স অনার্স ছাত্রদের জন্য। প্রথম ঘরে দু'জন থাকায় আমি ঐ ঘরেই ঢুকলাম।

ডাইনিং হল তখন ছিল না। বারান্দায় বসে খেতে হত। পরিবেশন করত, যতটা মনে পড়ে, পাশের মাঝিপাড়ার সোম, মঙ্গল, বুধু (বুধন হতে পারে), বুধুর বাবা এবং আরো দু'একজন। পরে শুনেছি কলেজ পোড়ানোর অপরাধে প্রথম তিনজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছিল।

খাবার থালা ছিল সব নিজের নিজের—কলাই করা। অ্যালুমিনিয়াম বা হিন্ডেলিয়ামের থালা তখন ছিল না। স্টেইনলেস স্টিল তো অনেক পরের ব্যাপার। নিজের নিজের থালায় খেয়ে নিজে ধুয়ে নিজের কাছে রাখতে হত। পরে যখন ডাইনিং হল হল, তখন সব থালা জমা করে দিতে হল। কেউ কেউ অবশ্য নিজের কাছেও রেখেছিল। থালা জমা নেওয়ার পর আর নিজেদের থালা ধুতে হত না। কুয়ো তলায় দুটো বড়ো বড়ো ডেকচি রাখা থাকত, সেখানে থালা দিয়ে দিতে হতো। দুজন কাজের মহিলা সেগুলো ধুয়ে ডাইনিং হলে রেখে দিত। সবাই অবশ্য সুষ্ঠুভাবে রাখত না, দূর থেকে ছুঁড়েও দিত। কুয়োতলায় সিমেন্টে পড়ে টুকরো টুকরো কলাই করা অংশ উঠে লোহা বেরিয়ে পড়ত। এরপর খাবার সময় খুঁজতে হত কোনটি অক্ষত বা কম ক্ষত।

হোস্টেল চলত মেস সিস্টেমে। তখন বর্ষাকাল হওয়ায় এবং এখনকার মত এত সব্জি না পাওয়ার কারণে প্রায় প্রতিদিন ভেন্ডি, ডাঁটা, লাউ, কুমড়ো এইসব তরকারি হতো। সদ্য বাড়ি থেকে গিয়ে খেতে বেশ কষ্ট হতো। পরবর্তীকালে সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদা হোস্টেলের দায়িত্ব নেওয়ায় রান্নার মানের বেশ উন্নতি হয়, প্রায় বাড়ির মতো। রান্নার ঠাকুর ছিলেন রবীদা, কাঁচা-পাকা চুল ও মুখ ভর্তি দাড়ি। একেবারেই ভাল রান্না করতে পারতেন না। পরে অন্য একজন যোগদান করেন, পাঁচুদা। তার হাতের রান্না বেশ ভালো ছিল। খুব মোটাসোটা হওয়ার কারণে আমরা তাকে আড়ালে বল্লভ (অজ্ঞাতবাস কালে ভীমের ছদ্মনাম) বলে

ডাকতাম। বিশ্বনাথদার মেনু ও তদারকি, পাঁচুদার রান্না বাড়ির খাওয়াকেও হার মানাত। তখন মাসের শেষে গ্র্যান্ড ফিস্ট ও দু'বেলা আমিষ খেয়েও মাসের মেস চার্জ হত ৪৮ টাকা থেকে ৫২ টাকা। একবার এক ম্যানেজারের সময় চার্জ হয়েছিলো ৫৫ টাকা, সে কি ঝামেলা।

সে সময় দুই ধরনের কোর্স ছিল, একাদশ শ্রেণির পর উচ্চ মাধ্যমিক (হায়ার সেকেন্ডারি) আর দশম শ্রেণির পর স্কুল ফাইন্যাল। যারা স্কুল ফাইন্যাল পাস করত তাদের কলেজে একবছরের ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স বা ইউ ই পাস করতে হতো। এই কলেজ থেকেই যারা ইউ ই পাস করে প্রথম বর্ষে ভর্তি হতো তাদের ছিল কলেজ ও হোস্টেল সম্পর্কে একটু বেশি অভিজ্ঞতা। অধ্যাপকগণের সাথেও তারা আগে থেকেই পরিচিত ছিল। আমরা যারা নূতন, তারা একটু পিছিয়ে শুরু করতাম। একটা সূক্ষ্ম বিভেদ রেখা প্রথম দিকে থাকলেও পরবর্তীতে এই বিভেদ মুছে যায়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বন্ধুগোষ্ঠী তৈরি হয়।

হোস্টেল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অবশ্যই বলতে হয় অনুপদা (অনুপ মিত্র), পার্থদা (পার্থ কোনার) ও প্রভাতদা (প্রভাত ব্যানার্জী)-দের কথা। আমাদের এক ইয়ার সিনিয়র। তিনজনেই ছিলেন হরিহর আত্মা ও কলেজের হিরো। স্যারও ওদের কিছু বলতেন না। অনুপদা ও পার্থ দা ড্রেনপাইপ প্যান্ট আর পয়েন্টেড স্যু পরতেন। প্রভাতদা পরতেন পাজামা ও পাঞ্জাবি। যখনই দেখা যেত তিনজনকেই একসঙ্গে দেখা যেত। পার্থদা মারা গেছেন, অনুপদা আছেন রাজস্থানের উদয়পুরে, প্রভাতদা আছেন কলকাতাতে। দু'জনের সাথেই যোগাযোগ আছে। প্রভাতদা পার্ট-টু পরীক্ষা দেওয়ার পর বেশ কিছুদিন হোস্টেলের সুপারও ছিলেন। আর একটি জুটি ছিল জলদদা ও বলরামদা।

হোস্টেলের সমস্ত জানলা স্যারের (ডঃ কে ডি রায়) নির্দেশে খোলা রাখতে হত, সে শীতকাল হলেও। প্রত্যেকদিন সকালবেলা স্যার হোস্টেলে চলে আসতেন। সকলকে তার আগেই উঠে পড়তে বসতে হত। যে উঠতে পারত না তাকে ডেকে দিতেন। কখনো কখনো গায়ে জলও ঢেলে দিতেন। প্রায় ন'টা পর্যন্ত হোস্টেলে থাকতেন ও রুমে রুমে ঘুরতেন। আবার সন্ধ্যাবেলাতেও হোস্টেলে এসে রাত ন'টা পর্যন্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে এসে বসতেন। সিগারেট খেতেন খুব। মাঝে মাঝে সিগারেট খানিকটা টেনে রুমে রেখে চলে যেতেন। ফিরে এসে বলতেন, ''কিরে তোরা খাসনি?''

ফার্স্ট ইয়ারের বেশ কিছুদিন ক্লাস হওয়ার পর প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস শুরু হবে। স্যার কলেজে বললেন, ''প্রত্যেকে অটো-ফাইল কিনে আনবি।'' পরের দিন কিনব ভেবে দু'একজন ছাড়া কেউই কিনিনি। সন্ধ্যাবেলা স্যার আমাদের রুমে এসে বসে সকলকে অটো-ফাইল নিয়ে আসতে বললেন। আমরা কেনা হয়নি বলায় কারন জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে সামনে ঝুলে থাকা কাঠের হ্যাঙ্গারের মার। পরের দিনই আমরা সবাই ফাইল নিয়ে হাজির।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় হোস্টেলের (সত্যানন্দ ছাত্রাবাস) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আমরাও দ্বিতীয় বর্ষে উঠেছি। আমরা স্থানান্তরিত হলাম নূতন হোস্টেলে।

এখন থেকে হোস্টেলের পড়াশুনার তদারকিতে আসতেন মিলনদা, প্রণম্য ও শ্রদ্ধেয় মিলন কুমার চ্যাটার্জী, যিনি পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় রেজিস্টার হয়েছিলেন। ফর্সা, সুদর্শন, তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মিলনদা সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট ও কালো স্যু পরতেন। আমরা, প্রতিটি ছাত্র মিলনদাকে ভয় করতাম—শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়। ওনার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস খুব কম ছাত্রের ছিল।

সন্ধ্যাবেলা তিনি একটি ডায়নামোর আলো লাগানো সাইকেলে চেপে হোস্টেলে আসতেন। থাকতেন রাত্রি ন'টা পর্যন্ত। এই সময় কালে তিনি দু'টি হোস্টেলেই লাগাতার পায়চারি করতেন। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাইরে থেকে বেরিয়ে কলেজের মাঠে এসে বসতাম। যেই দূরে ডায়নামোর আলো দেখতাম অমনি রুমে এসে বিছানায় বই খুলে বসে পড়তাম। আলো তো অন্য কারও হতে পারে—এটা ভাবার অবকাশ ছিল না।

একবার আমার সর্দি হয়েছে। বার বার বাইরে আসছি। যতবার বাইরে আসছি ততবার সামনে মিলনদা। আমাকে বললেন, ''আজ তোমার সিক মিল, মাংস খেতে পাবে না'' সেদিন ছিল মাসিক গ্র্যান্ড ফিস্ট। যাওয়ার সময় অবশ্য ঠাকুরকে বলে গেছিলেন আমার রুমে খাবার পৌঁছে দিতে।

একবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছি। অ্যাটেস্টেড ফটোর দরকার পড়ল। ফটো সঙ্গে থাকলেও তা অ্যাটেস্টেড ছিল না। মনে পড়ল মিলনদা বিশ্ববিদ্যালয়ের

রেজিস্টার। ওনার রুমে গিয়ে অ্যাটেনডেন্টকে স্লিপ দিলাম। কিছুক্ষণ পর অ্যাটেনডেন্ট এসে বলল স্যার ভি সি-র রুমে আছেন, ওখানে যেতে বলেছেন। গেলাম ভি সি মহাশয়ের রুমে। দরজায় মুখ বাড়াতেই মিলনদা বললেন, ''ভিতরে এসো''। দেখেই চিনতে পারলেন। ভি সি মহাশয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফটো দেখে বললেন এ ফটো উনি অ্যাটেস্ট করতে পারবেন না। আমাকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, ''শরীর খারাপ হয়ে গেছে, শরীরের যত্ন নাও''। একেবারে আত্মীয়ের সুর গলায়। অভিভূত হয়ে গেলাম। পরে ফটো অ্যাটেস্ট করে দিলেন, বলাই বাহুল্য।

আমাদের হোস্টেল থেকে বাড়ি যেতে গেলে নিরঞ্জনদার (যিনি একাধারে ছিলেন কলেজের হিসাব রক্ষক আবার হোস্টেলের সুপারও) লিখিত দরখাস্ত করে অনুমতি নিতে হতো। সিনেমা দেখতে গেলে মৌখিক অনুমতি নিতে হত, সে ছুটির দিন হলেও। একবার আমরা কয়েকজন অনুমতি না নিয়েই সিনেমা দেখতে গেছি। রাস্তায় দর্শনের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সনাতন দা (সনাতন দাস) আমাদের দেখেছেন ও স্যারকে জানিয়ে দিয়েছেন। সিনেমা দেখে ফেরার সময় দেখি স্যার রাস্তায় পায়চারি করছেন। আমাদের দেখেই এক এক জনের নাম ধরে বললেন, ''তোমরা কলেজ থেকে সাসপেন্ডেড, কাল লাইব্রেরির সব বই ফেরৎ দেবে। পরীক্ষা দেওয়া যাবে না, বাবাদেরকেও জানানো হয়েছে।'' সামনে ছিল টার্মিন্যাল পরীক্ষা। কয়েক দিন পর বাবা এলেন, স্যারের সঙ্গে দেখা করলেন। স্যার শুধু প্রশংসা করে গেলেন, সাসপেনশান নিয়ে কোনো কথা বললেন না। বাবা চলে গেলে বললেন, ''সোমবার থেকে কলেজ করবে, কাল লাইব্রেরির বই নিয়ে নেবে, পরে তোমাদের টার্মিন্যাল পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া হবে।'' পরের দিন রবিবার—সেটা জানানোয় বললেন, ''কুমকুম কে (লাইব্রেরিয়ান কুমকুম মজুমদার) ডেকে পাঠিয়েছি। কাল নয় টার সময় আসবে। বই নিয়ে নিতে হবে।'' আমাদের জন্য আবার নতুন ভাবে টার্মিন্যাল পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। স্যার ছিলেন প্রকৃতপক্ষে আমাদের অভিভাবক।

আমরা অনার্স পড়লেও পাস কোর্সের ক্লাস করা ছিল বাধ্যতামূলক। কোনো অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে অন্য অধ্যাপক এসে ক্লাস নিতেন, ক্লাস না হওয়ার কোনো প্রশ্ন ছিল না। বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ছিলেন প্রণম্য লালমোহন মণ্ডল, বিরিঞ্চি কুমার মণ্ডল, বিজন মুখার্জী, তারেশ দাশ, শ্রীপদ মুখার্জী (অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, কলেজে জৈব রসায়ন পড়াতেন), মিলন কুমার চ্যাটার্জী, নন্দগোপাল মুখার্জী, বিশ্বভারতী থেকে সাউন্ড পড়ানোর জন্য আসতেন সম্ভবত এস এস (পুরো নাম মনে নেই), কিছু পরে এলেন মিহির কুমার চন্দ্র ও একেবারে শেষের দিকে শক্তিপদ কুইল্যা। প্রত্যেকেই যত্ন নিয়ে পড়াতেন। ক্লাসেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতেন। কেউই টুইশানি পড়াতেন না।

একবার লালমোহনদার গলা নকল করে আমাদের পাস কোর্সের সহপাঠী অবনীশ সিনহা রোল কল করছে। লালমোহনদারই ক্লাস ছিল। লালমোহনদা কিছুক্ষণ পরেই হাজির। আমরা সবাই হতভম্ব, অবনীশ একেবারে চুপ। লালমোহনদা রাগ করলেন না। বললেন, ''বাহ, বেশ হচ্ছে, শেষ করো।'' তিনি জানতেন, তাঁকে আমরা খুব সম্মান করতাম, অবনীশ কোনোভাবেই তার অসম্মানের জন্য এরকম কাজ করেনি, এ নিছকই মজা। রোল কল শেষে তিনি সহ আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

ফিজিক্স অনার্সে আমার যতটা মনে পড়ে, আমরা ছিলাম—আমি, সুশীল কুমার ঘোষ, দেবনারায়ণ ধর, অরুনেশ চক্রবর্তী, শ্রীধর সাহা, দেবব্রত রায়, সব্যসাচী দত্ত, গোলোক হরি দাস, সুনীল পাল, অরুণলাল মণ্ডল, গৌতম মুখার্জী, দীনবন্ধু কর্মকার, মহাদেব উড়িন্দা, সোমেশ্বর দে, শান্তি চ্যাটার্জী, শ্যামল দাস, অতুলেন্দু ব্যানার্জী, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র, কালীসাধন দত্ত, গিরিজা শঙ্কর পণ্ডিত, পার্থ সারথি ঘোষাল এবং আরও চার জন। এদের মধ্যে কালীসাধন দত্ত, সুনীল পাল, অরুণলাল মণ্ডল, শ্যামল দাস, গোলোক হরি দাস আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের শেষ দিকে বর্ধমানে মেডিকেল কলেজ খোলায় সেখানে চলে যায়। এদের কারও কারও সঙ্গে এখনও যোগাযোগ থাকলেও বাকিরা কোথায় আছে, কেমন আছে জানা নেই।

জীবনের এই উজ্জ্বল অধ্যায়ে এরকম আরো কত ঘটনা আছে। স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আরো পরিসর তৈরি হোক। আরও কথা বলব। বাকিদের সঙ্গেও যোগাযোগ হোক। এক বিস্তৃত সময়ের সম্পর্ক তৈরি হোক আমাদের নিজেদের মধ্যে।

সোনালী স্মৃতি

তুষার মজুমদার

প্রবেশবর্ষ : ১৯৭৯

কবি জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'। কিন্তু হৃদয় খুঁড়লে সবসময় যে বেদনাই আসে তা নয়। কখনো আবার এ হৃদয় 'নব আনন্দে' জেগে ওঠে। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনী হিসাবে অভেদানন্দ ক্যাম্পাসে কাটানো কম বেশি চার বছরের স্মৃতি রোমন্থন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মনে পড়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি পংক্তি 'স্মৃতির বালুচরে মুখেরা ভিড় করে, কেন যে ভিড় করে? আমি তো ক্লান্ত।' কিন্তু সত্যি বলতে কি 'স্মৃতির বালুচর' যখন সুন্দর মাঠের ঘাসময় ক্যাম্পাস, তখন সমস্ত ক্লান্তির অবসাদ ধুয়ে যায় কোন এক অমল শ্রাবণের আনন্দধারা। বলতে ইচ্ছে করে—'না চাহিতে মোরে যা করেছ দান— আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ, দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহা দানেরই যোগ্য ক'রে'। আজ ৬০ অতিক্রম করা পড়ন্ত বেলায় বলতে দ্বিধা নেই, জীবনের সবচেয়ে সোনালী অধ্যায় আমরা ফেলে এসেছি সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সবুজ মাঠ, ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে তরকা-রুটি, তুমুল মার্জিত হুল্লোড়ে। জীবনের সবচেয়ে হিরন্ময় মুহূর্তগুলো যেন ফ্রেমে বন্দি হয়ে আছে, সরস্বতী পূজো, খেলাধুলা, লাইব্রেরি গঠন, সেমিনার বা বিতর্ক সভায় শানিত যুক্তিবোধে।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসি সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে। বাড়ি আমোদপুরের কাছেই। তবু হোস্টেলে। ম্যাথাম্যাটিক্সে অনার্স নিয়ে ভর্তি। হোষ্টেলে ঢুকেই দেখলাম র‍্যাগিং নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত। সবার র‍্যাগিং হচ্ছে একে একে। আমার পালা আসছে না। পূজার ছুটির ঠিক আগে আমার পালা। মনে মনে কঠিন জেদ ধরেছিলাম। সাত-আট জন সিনিয়রদের মাঝখানে আমি একা। শুরুতেই বললাম, আমার বাড়ি একটা স্টেশনের পরেই। এমন কিছু করবেন না যাতে আমাকে হোস্টেল ছাড়তে হয়! দেখলাম সবাই যেন কেমন নরম হয়ে গেলো। কিছু গতানুগতিক কথা হওয়ার পর বেরিয়ে এলাম। দেখলাম আমার ব্যাচের সবাই আমার রুমে আলো অফ করে বসে আছে। আমি ঢুকতেই সবাই চিন্তামুক্ত হলো। সবাই শপথ নিলাম এ প্রথা বন্ধ করতে হবে। স্যার লালমোহনবাবুর কাছে দরখাস্ত করলাম, হোস্টেলে নির্বাচন করতে হবে। আমি প্রথম বছরের ছাত্র, আমাকে বলল প্রার্থী হতে হবে। সিনিয়র দু'জনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১১-১২ ক্লাস, আর প্রথম বছরের ছাত্ররা সবাই আমাকে ভিতরে ভিতরে সমর্থন করছে। আমাদের শ্লোগান হলো, ভয়ের পরিবেশকে মুক্ত করতে হবে। যারা পাস করে বা ফেল করে বছরের পর বছর হোষ্টেলে থাকছে তাদের চলে যেতে হবে। ভোটের দুদিন আগে বাকি দু'জন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াল। আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলাম। প্রিফেক্ট হওয়ার পর কলেজে দাবি তুললাম একজন দক্ষ হোস্টেল-সুপার চাই।

মিলনবাবু হলেন সুপার। হোস্টেলের সংস্কার শুরু হল। লাইব্রেরি তৈরি হল। সরস্বতী পুজোর আগে ব্যাপক ঝামেলা। শহর বনাম হোস্টেল। রাতে বোম মারা হল। 'সাদা পোশাক' যাত্রা দেখে ফেরার সময় খাসি তুলে নিয়ে চলে আসাকে কেন্দ্র করে, আঁধ্গালিয়া ময়দান থেকে ক্রিকেট- পিচের জন্য রোলার নিয়ে চলে আসাকে নিয়ে ঝামেলা শুরু। সে এক অন্য অনুভূতি।

আসলে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। বদলে গেছে অনেক কিছুই। শুধু পাল্টায়নি আমাদের সোনালী পালকগুলি। তাই এখনো সতীর্থদের সঙ্গে যখন স্মৃতির ধুলো ঝেড়ে হৃদয়ের পুরানো আলব্যাম খুলে বসি তখন বলতে ইচ্ছে করে—

'থাকুক তোমার একটু স্মৃতি থাকুক
একলা থাকার খুব দুপুরে
একটি ঘুঘু ডাকুক।'

আমার হোস্টেল : আমার জীবন গড়ার কারিগর

দেবদুলাল দাস

প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৩

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ছেড়ে সাঁইথিয়া অভেদানন্দ কলেজে ভর্তি হলাম ১৯৮৩ সালে, গণিত-এ অনার্স নিয়ে পড়ব বলে। বাড়ি আমার বীরভূমের নলহাটি-র কাছে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। ছয় ভাইবোনের সংসার। আমার বাবা সেচ বিভাগে ছোট একটা পদে কাজ করতেন। খুব আর্থিক সংকটের মাঝে পড়াশোনা চালিয়ে গেছি।

১৮৮৬ সাল মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে LIC-তে ক্ল্যারিক্যাল পদে ভ্যাকান্সি বেরিয়েছে। আবেদন করে ফেলেছি। পড়াশোনার মাঝে চাকরির কি প্রস্তুতি নেব? যতদূর মনে পড়ে বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক সুধীর রায় মহাশয় আমাদের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের লাইব্রেরিটির উদ্বোধন করলেন ২১সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সালে। যাদের প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছিল তারা হলেন আমার সম্মানীয় বুলিদা, তাজদা, চিন্ময়দা, আমার সহপাঠী বর্তমানে স্বর্গীয় শুভেন্দু এবং আরো অনেকে। আমাদের নিতাইদার উপরের রুম-এ যেখানে ছাত্রদের সেশন শেষ হলে সবাইকে নিয়ে ছবি তোলা হত এবং সাজিয়ে রাখা হত—সেটাই হল আমাদের লাইব্রেরি রুম। তখন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন কুণ্ডলার শংকর মুখার্জি।

আবাসিক ছাত্রদের কন্ট্রিবিউশনে এই লাইব্রেরিতে কম্পিটিশন সাকসেস রিভিউ, কম্পিটিশন মাস্টার, চারটি দৈনিক খবরের কাগজ, বর্তমান, আনন্দবাজার ইত্যাদি, দেশ পত্রিকা, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, দেশ বিদেশের খেলার খবর, তাছাড়াও অনেক লেখকের উপন্যাস পড়ার সুযোগ এই লাইব্রেরির সুবাদে পেয়েছিলাম। হোস্টেলে অনেক সাহিত্যপ্রেমী ছিল, যেমন বর্ধমানের আলমগীর, মালদার মিনহাজুদ্দীন, জসিমদা। তাদের সংস্পর্শে এসে আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্যপ্রেমী হয়ে উঠেছিলাম। প্রতিদিন রাত্রের খাওয়া শেষ করে আমাদের প্রিয় লাইব্রেরিতে কম্পিটিশন সাকসেস রিভিউ ও আরো অন্যান্য ম্যাগাজিন পড়তাম। আমার সহপাঠীরা বলত, তোর কি চাকরি খুব দরকার?

তখন একটা বার্নিং টপিক ''we want peace–not war''। লিবিয়ার সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ লেগেছে। আমার মনে হল LIC-র পরীক্ষাতে এটা আসবে। আমার হোস্টেলের অতি প্রিয় বন্ধু দিলীপ সাহাও ছিল এই কম্পিটিশন এক্সামের পরীক্ষার্থী। সে বলল, 'এটাই পরীক্ষাতে আসবে ভাবলি কি করে?' কিন্তু সেটাই হল। পরীক্ষায় ইংলিশ পার্ট-এ ওই টপিকটাই এসেছে। মনের মতো করে লিখলাম। দিলীপ বীরভূম জেলা স্কুলের সেরা ছাত্র। অঙ্কে বোধ হয় ১০০-এ ৯৯ পেয়েছিল। অঙ্কে আমরা LIC-র কম্পিটিশন পরীক্ষায় ১০০ এ ১০০ স্কোর করেছিলাম। দিলীপ এর সঙ্গে ব্যবধান হয়েছিল এই essay টাতে। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের এই লাইব্রেরি আমার জীবনের মোড় বদলে দিয়েছিল। আজ আমি LIC-র সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। রুমমেট তোজাম্মেলকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুর ব্রাঞ্চ LIC-তে যোগদান করলাম ১৬ জুন ১৯৮৬। প্রথম মাসের বেতনে আমার মা (বর্তমানে স্বর্গগত) এবং আমার দুই বৌদির শাড়ি কিনে বাকি টাকা হোস্টেলে গ্র্যান্ড ফিস্ট-এ খরচ করে খুব আনন্দ করেছিলাম। তোজাম্মেল (ফটিক) বলল, চাকরিটা লটারির মতো পেয়ে গেলি।

দিলীপ, সিরাজের মতো বন্ধু খুব ভাগ্য করে পাওয়া যায়। আসানসোল পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সবটাই দিলীপের খরচায়। দিলীপ এর বাড়ির অবস্থা খুব ভালো ছিল। আমি, পীযুষ, শুভেন্দু দিলীপকে মল্লারপুরে অসুস্থ অবস্থায় দেখা করতে গিয়ে প্রচুর খাওয়া দাওয়া করে হোস্টেলে ফিরলাম।

আমাদের পুরী বেড়াতে যাওয়ার খরচা সিংহভাগ সিরাজের মা দিয়েছিলেন।

বন্ধুরা বলেছিল, চাকরিটা কি তোর খুব দরকার? চাকরিটা সত্যিই খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ আমার বয়স ২০ বছর হলেও তখন যে একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছি। এখন সে-ই আমার জীবনসঙ্গিনী।

শতকোটি প্রণাম আমার এই সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের লাইব্রেরিকে। আমাকে লাইব্রেরিতে পড়াশোনার জন্য আরো যারা প্রেরণা জুগিয়েছিল তারা হল আলমগীর (মানিক), ভাই পলাশ ব্যানার্জী, গৌতম ব্যানার্জী, তাপস মণ্ডল ...। আসলে একজন দু'জন নয়, আমার এই সাফল্যের পেছনে ছিল হোস্টেলের সমস্ত কিছু।

চাকুরিসূত্রে আমি এখন বর্ধমান ব্রাঞ্চে। খুব ব্যস্ততার সঙ্গে দিন কেটে যায়। আমার এই সদাব্যস্ত জাগরণে আমার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকে আমার সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। প্রত্যেক দিনের শেষে আজও একবার সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের গ্রুপ না দেখে ঘুমোতে পারি না। আমার ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে সেই সোনালী দিনগুলো।

ফুল-সুন্দর হও

সাদেক আলী বিশ্বাস

প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৪

প্রথমে একটা ঢং ঢং ঢং ঘন্টা। তারপর ঘোষাল ঠাকুরের উদাত্ত আহ্বান 'খেতে খেতে খেতে' মনে হয় আজও বুঝি কানের কাছে বাজছে। প্রায় আটত্রিশ উনচল্লিশ বছর আগের জীবনের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের তিনটি বছর জীবনে-মননে-স্মৃতিতে এমন গেঁথে আছে যা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অনুরণিত হতে থাকে সমস্ত চেতনা জুড়ে।

ছাত্র হিসাবে ছিলাম খুবই সাধারণ। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে কোনরকমে পাস করি। তারপর স্ট্রিম চেঞ্জ করে বাংলা অনার্স পড়তে যাওয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে। এ ব্যাপারে আমার পথিকৃৎ ছিল মোতি মতিউর রহমান। তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিসভার ক্রীড়া মন্ত্রী বুটা সিং-এর নামে পরিচিত ছিল সে। সবাই তাকে 'বুটা', 'বুইটা' এরকমভাবে সম্বোধন করত। কারণ মোতি ছিল হোস্টেলের গেমস সেক্রেটারি।

হোস্টেলে আমার প্রথম পদার্পণের দিনটি ইতিহাসের উপাদানে ভরপুর। দিনটা ছিল ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর, যে দিনটি নিয়ে গোষ্ঠগোপাল দাস গান বেঁধেছিলেন ''৩১-এর অক্টোবরে ১৯৮৪, বুধবার দুপুরে হায়রে / কি নিদারুণ খবর পেল ভারতবাসী বেতারে''। বাক্স-প্যাটরা বেঁধে সেই বুধবারে সকাল সকাল রওনা দিই মালদা শহর থেকে ডি.এস.টি.সি. বাসে। মনে হয় বেলা তখন চারটে—সিউড়ি থেকে মালপত্র সমেত সাঁইথিয়াগামী একটা লোকাল বাসে উঠি। কি একটা গুঞ্জন শুনি। প্রথমে কিছু বুঝতে পারি না। তারপর মর্মে পৌঁছায় লোকজনের কথাবার্তা—ইন্দিরা গান্ধী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কি করে এত সময় লাগল জানি না তবে রিকশা নিয়ে হোস্টেল যাওয়ার পথে যখন রেল ব্রিজ ক্রস করছি তখন রাস্তার ধারে সবাই সন্ধ্যা সাতটার বিবিসি বাংলা নিউজ শুনছে।

হোস্টেলে পৌঁছে আর এক ধাক্কা। সেই সময় কলেজ, হোস্টেল সবই বন্ধ। ভুল খবর পেয়ে সাত-আট দিন আগেই পৌঁছে গেছি আমি। যাহোক অসুবিধা হল না, নিচের তলার ডান দিকের বাথরুমের কাছাকাছি একটা ঘর খুলে দেওয়া হল আমার জন্য। আর বিশুদা, হোস্টেলের অন্যতম পাচক থাকেন পাশেরই হোস্টেলে, তার কাছে হলো খাওয়ার ব্যবস্থা। হোস্টেলে তখন শুধু ফিজিক্স অনার্সের থার্ড ইয়ারের ছাত্র মুন্সীদাদের ব্যাচ—তাঁরা ছিলেন উপরে। তাও পরদিন তারা সবাই বেরিয়ে গেলেন। ভাবা যায়, নিচে কুড়ি উপরে কুড়ি মোট চল্লিশটা ঘর হোস্টেলের, বাইরে ফাঁকা মাঠ, আলুর ক্ষেত সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরিবেশ—এত বড় হোস্টেলে আমি একা। ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না, রাতও পার হয় না। বাড়িতে একটা ইনল্যান্ড লেটার কার্ডে খবরাখবর জানিয়ে চিঠি লিখলাম। তাতে কিছুটা সময় কাটল। সেই চিঠি পৌঁছায় অনেক দেরিতে। পরে জেনেছি, তখন আমার জন্য দুশ্চিন্তায় তুলকালাম কাণ্ড বাড়িতে। আমার তখন মুখ ভর্তি দাড়ি। আর তখন শিখ সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষজনদের ধরে ধরে কোতল করা হচ্ছে দেশজুড়ে। আমার খবর নেওয়ার জন্য কলেজের ফোন নম্বর জোগাড় করে কলেজে যোগাযোগ করা হয় মালদা শহর থেকে ট্রাঙ্ক কলে (তখন মোবাইল ভবিষ্যতের গর্ভে, সাধারণ ল্যান্ডলাইনে দূরে ফোন করতে হলে ট্রাঙ্ক কল করতে হতো)। রিং হয়ে গেলেও ফোন ধরার মতো কেউ ছিলেন না। কারণ তখন কলেজ বন্ধ যে। দু'তিন রাত এভাবে পার করার পর ভালকুটি থেকে চলে এলো একজন—দেবদাস চ্যাটার্জী। আমারই মতো ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। খুব দ্রুত বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমাদের। পরে তার বাড়ি গেছি তারই উপনয়ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে।

ক্লাস আরম্ভ হল ক'দিন পর। রাস্তার ধারে কলেজ।

পিছনে কলেজেরই বিশাল খেলার মাঠ। তার পিছনে হোস্টেল—সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। বাস ধরা নেই, ধস্তাধস্তি ঘাম বিনিময় নেই—পাঁচ মিনিটে ক্লাসে পৌঁছে যাওয়া যায়। কখনো কখনো অফ পিরিয়ডে নিজের রুমে চলে আসা যায়। সদ্য যৌবনোত্তীর্ণ কতগুলো ছেলে একসাথে থাকা, পড়াশোনা, খাওয়া, খেলাধুলা, আড্ডা—এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। হোস্টেলের মূল দরজার উপরের যে ক্যান্টিলিভার তার উপর বসে দেখা যায় সামনে ফাঁকা মাঠ, কলেজ, রাস্তার কিছু অংশ। সেই ক্যান্টিলিভারে বসে কত যে আলাপচারিতায় বন্ধুত্বঘন মুহূর্ত রচিত হয়েছে!

এক হোস্টেল জীবনে থাকে অনেক অভিজ্ঞতা, অনুভব, উপলব্ধি—অনেক স্তর।

হোস্টেল থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে হোস্টেল—যাতায়াতের প্রায় একমাত্র মাধ্যম ছিল মাঝরাতের গৌড় এক্সপ্রেস। এ নিয়ে এক হাস্যকর অভিজ্ঞতা আছে। সাঁইথিয়া স্টেশনে গৌড় এক্সপ্রেস পৌঁছতো রাত বারোটা পাঁচে, আর বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেন ধরতে হত রাত দুটো পঁচিশ কি পঁয়ত্রিশে। অত রাতে একা ট্রেন ধরতে আসাটা ছিল সত্যি কষ্টের। ভয় আমার কোনোদিন ছিল না। দিনকাল তখন ভালো ছিল। ফলে লোকেরও তেমন ভয় ছিল না। ভয় ছিল রাস্তার কুকুরের। গরমকালে কুকুরগুলো রাস্তায় কান পেতে শুয়ে থাকতো। আর পাশ দিয়ে গেলেই মাথা উঁচু করে উ-উ-উ করে এক অদ্ভুত আওয়াজ করত। বুকে ভয় ধরিয়ে দিত। একদিন কি হল—হোস্টেলে ফিরছি। তিন-চারটে কুকুর আমার পিছু নিল। আমি হাঁটি, পিছন পিছন ওরাও হাঁটে। আমি দাঁড়ালে ওরাও থমকে যায়। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। একসময় একটু দ্রুত পায়ে হাঁটার চেষ্টা করি, তখনই কুকুরগুলো এমন করল যেন গায়ে উঠে যাবে। নিরুপায় হয়ে রাস্তার পাশে সদ্য পুঁতে রাখা সজনে গাছ উপড়ে নিয়ে রুখে দাঁড়াই। আক্রমণ কখনো কখনো আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। এবার তারা নিরস্ত হয়।

হোস্টেলে আমরা লাভ করেছি এক মুক্ত জীবন। সেই মুক্তি আমরা উপভোগ করেছি পারস্পরিক মেলামেশায়, ভাষা ব্যবহারে। অবশ্য স্বাধীনতার অপব্যবহার আমরা কখনো করিনি। ভাষাবিজ্ঞানে 'কোড বদল' বলে একটা কথা আছে। আমরা যেখানে যেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, সেখানে সেভাবে ভাষা ব্যবহার করি। বাড়িতে যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি অফিস আদালতে গিয়ে নিশ্চয়ই সে ভাষায় কথা বলি না। এই যে পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষার বদল—একে 'কোড বদল' বলে। হোস্টেলের অভ্যন্তরে এরকম একটা উপভাষা চালু ছিল, যা হোস্টেলের দরজার বাইরে পা দিলে আমরা সচেতন ভাবে পরিহার করতাম। আর যেখান থেকেই ফিরি, হোস্টেলে পা দেওয়া মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেসব মুখ দিয়ে নিঃসৃত হত এবং কানে শুনেও আমরা ধন্য হতাম।

কালের ইতিহাসে কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। চুরাশি থেকে সাতাশি এবং তারপরেও যে সময়টাকে প্রত্যক্ষ করেছি আজ তারই ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নিহত হলেন, যেদিন আমি সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে পৌছালাম। আশির দশকে শিখ সম্প্রদায়ের একটা অংশ 'খালিস্তান' নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসমেত তাদের নেতা জার্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে আশ্রয় নেয়। ১৯৮৪ সালের জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে সেনা নামিয়ে ভিন্দ্রানওয়ালে সমেত অনেককে হত্যা করা হয় এবং অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ইতিহাসে যা 'অপারেশন ব্লু স্টার' নামে পরিচিত। আর তারই বদলা নিতে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী শতবন্ত সিং এবং বিয়ন্ত সিং তাঁর উপর গুলি চালায়। বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টুলির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল সেদিন। ১০ নম্বর জনপথের বাসভবন থেকে সেই উদ্দেশ্যে হেঁটে অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি।

ইন্দিরা গান্ধী হত্যার এই ঘটনায় দেশের রাজনীতি মোড় নিল এক নতুন দিশায়। কারণ কনিষ্ঠপুত্র সঞ্জয় গান্ধীর ইচ্ছায় দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন ইন্দিরা ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৭ এর নির্বাচনে তাঁর ভরাডুবি হয়। কিন্তু ১৯৮০ সালে আবার তিনি ক্ষমতায় ফেরেন। সেই বছরই বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধী নিহত হন। তখন রাজীব গান্ধীকে কেউ চিনত না। ইন্দিরা গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পেশায় তিনি পাইলট—এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু

রাজনীতির ময়দানে রাজীব গান্ধীর উৎক্ষেপণ চাইলেন ইন্দিরা। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেঙ্গল ট্যুরে এলেন রাজীব। খুব মনে আছে, ২৯ অক্টোবর সোমবার মালদার বৃন্দাবনী ময়দানে রাজীব গান্ধীর মিটিং চলছে। তেমন জনসমাগম নেই। গনি খান চৌধুরী সাহেব ভাষণ দিতে উঠলেন, অদূরে রাজীব গান্ধী বসে। আমি ফাঁকা জমায়েতের মাঝেই সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে এক বন্ধুকে খুঁজছি—এই দৃশ্যটা আমাকে প্রায়ই তাড়া করে। ঘটনার দিন তিনি ছিলেন মেদিনীপুরে। তাঁর কাছে একটি জরুরি তার এল, 'There is an accident in your house.' রেডিওর নব ঘুরিয়ে তিনি বিবিসি শোনার চেষ্টা করলেন। সোমবার দিন মালদার মতো একটা মফস্বল শহরের মানুষেরও যার প্রতি কোনোরূপ আগ্রহ নেই, বুধবার সন্ধ্যায় তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র বলে আমরা শ্লাঘা বোধ করে থাকি। কিন্তু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের খামতিগুলো প্রায়ই আমাদের জাতীয় জীবনকে পশ্চাৎপদ করে রেখে দেয়। এগুলো অবশ্য একান্তই ব্যক্তিগত উপলব্ধি। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের রিক্রিয়েশন রুমে বসেই দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধের মারফত 'স্বদেশ' নামক ব্যাপারটি চেতনায় আসে। এখানে বসেই প্রথম দেশের রাজনৈতিক অভিঘাতকে চিনতে শিখি।

কলেজ জীবনের যারা বন্ধু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো ঘাটতি না থাকলেও খানিকটা সীমার মধ্যে তা আবদ্ধ থাকে। আর হোস্টেলে যেখানে আমরা একসাথে শুধু ঘুরি ফিরি তাই নয়, একসাথে খাই ঘুমাই—ফলে কোনো আড়াল থাকে না। প্রশান্ত, মলয়, কল্যাণ, হরনাথ, পরেশ, নিজাম, মনিরুল, গোরাচাঁদ এবং অনেককে যেভাবে পেয়েছি এদের সান্নিধ্যেই, বলতে বাধা নেই পরবর্তীকালের আমি একটু একটু করে গড়ে উঠেছি। বয়ঃজ্যেষ্ঠ দাদাদের মধ্যে যাদের কমবেশি পেয়েছি বুলিদা, ত্রিলোকদা এবং আরো অনেককে, তাদের খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং তাদের দেখে প্রেরণা পেয়েছি—ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ ঠিক করেছি।

অতীত আর বর্তমানের সংমিশ্রনেই জীবনের অস্তিত্ব। কত টুকরো স্মৃতি, কত ভালোলাগা, কত বেদনা কষ্টের অনুভূতি। ইচ্ছে করলেই যেন ছুঁয়ে ফেলতে পারি আজও। অতীতচারিতা মানুষেরই ধর্ম। সমরেশ মজুমদারের লেখা এক গল্পে পড়েছিলাম তিন বন্ধু ছেলেবেলার স্কুলে ফিরে গিয়ে সেখানকারই এক অসুস্থ মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করেন। নানা আলাপচারিতার পর মাস্টারমশাই বলেন, 'ভালো লাগছে একথা ভেবে যে, তোমরা সবাই মানুষ হয়েছে।' একজন জিজ্ঞাসা করে, 'স্যার, কি করে বুঝলেন যে আমরা মানুষ হয়েছি?' স্যার বললেন, 'একমাত্র মানুষই তার অতীতকে খোঁজে, পশুর কোন অতীত নেই।'

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীরা—আমরা যে আকুতি নিয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি—বুঝি আমরাও মানুষ হয়েছি।

স্মৃতি শুধু বেদনারই নয়, মধুরও বটে

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৫

১৯৮৪ সাল। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়ার পর্ব চলছে। আমার প্রথম থেকেই ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেসময় ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে পড়ার সুযোগ খুব একটা সুলভ ছিল না। সারা বীরভূম জেলার মধ্যে মাত্র সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজ এবং রামপুরহাট কলেজ এই দুটিতেই ইংরাজিতে অনার্স পড়ানো হতো। কিন্তু ইংরাজিতে আমার প্রাপ্ত নম্বর কিছুটা কম থাকায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইনি। তাই সাঁইথিয়ার অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম।

আমার গ্রাম সাঁইথিয়া ব্লকের আমোদপুর থেকে পাকা তিন কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত হওয়ার ফলে আমাকে আমোদপুর-কাটোয়া ন্যারো গেজ রেল লাইনের রাস্তা ধরে ট্রেন ধরার জন্য আমোদপুর আসতে হত। তখন আমোদপুর থেকে সাঁইথিয়া আসার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে ট্রেনই ভরসা ছিল। এখনকার মত বাসের ব্যবস্থা ছিল না। তাও আবার কলেজে পৌঁছনোর জন্য একটিই আপের ট্রেন ছিল—বামদেব। আমোদপুর থেকে ছাড়ত সাড়ে দশটায়। কোনোদিনই সঠিক সময়ে ছাড়ত না, যদিও আমি যত কষ্টই হোক সময়ের আগেই স্টেশনে বেশিরভাগ দিনই পৌঁছে যেতাম। ওদিকে অনার্সের প্রথম ক্লাসটা শুরু হত দশটা চল্লিশে। কোন দিনই প্রথম ক্লাসটা ধরতে পারতাম না। এইভাবেই একটা বছর প্রথম ক্লাসটা না করেই কাটাতে হয়। অতএব হোস্টেলে থেকে কলেজ করার কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা আমার পরিবারের ছিল না। বিষয়টি আমাদের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক স্বামী মহানন্দকে জানালে উনি আমাকে কলেজের সত্যানন্দ ফাণ্ড থেকে প্রতি মাসে দুশো টাকা করে ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাকিটা খুব কষ্ট করেই জোগাড় করে দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে ভর্তি হলাম। শুরু হলো আমার ছাত্রাবাস জীবনের।

এখানে পরেশনাথ ঘোষ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অনার্সের আমারই ব্যাচের হোস্টেল প্রিফেক্ট, বাবা ফাণ্ড থেকে সকলের অনুমতি নিয়ে আমাকে কিছুটা আর্থিক সহায়তা করত মাঝে মধ্যে। এইভাবেই পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে বরাবরই। সেসব করুণ কাহিনির ইতিবৃত্ত উল্লেখ করার জায়গা এটা নয়। তবুও অকৃতজ্ঞ হতে পারি না বলেই আমি যাঁদের দ্বারা উপকৃত হয়েছি তাঁদের কথা সুযোগ পেলেই বার বার স্মরণ করে কিছুটা তৃপ্তি পাই। এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

১৯৮৫-৮৭ প্রায় দুই আড়াই বছরের ছাত্রাবাস জীবনের কত কত মধুর সুখস্মৃতি বিজড়িত নানান ঘটনার রঙিন ছবি মনের ক্যানভাসে প্রতিবিম্বিত হয় আজও এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটে যাবে আজীবন, সেটা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দুর্লভ অনুভূতির প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি কবিগুরুর 'বর্ষাযাপন' কবিতার একটি ছত্রে ''অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে / শেষ হয়ে হইল না শেষ।'' সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে, এ যেন আমাদেরই অন্তর সানাইয়ের ব্যথাতুর সুরমূর্ছনার প্রতিধ্বনি!

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে আমরা সবাই সব ধরনের ভেদাভেদ ভুলে একেবারে আত্মার একান্ত পরমাত্মীয় হ'য়ে, একে অপরের প্রতি সহমর্মী হ'য়ে পরমানন্দে পড়াশুনা করতাম। কখনো মনে হয়নি আমরা আমাদের বাবা মা পরিবার পরিজনদের ছেড়ে একটা অপ্রত্যাশিত জায়গায় পড়ে রয়েছি। মনে পড়ে একবার আমি বাড়িতে এসেছি। চোখে কর্নিয়াল আলসার হয়েছে। বড্ড যন্ত্রণা। হোস্টেলে

ফিরতে পারছি না। যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। একটা পোষ্ট কার্ডে সেকথা লিখে জানাতেই সাদেক, একরামুল, মণিরুল, পরেশ সহ অনেকেই আমার কাছে এসে হাজির। ওরা আমাকে নিয়ে এল হোস্টেলে। পরের দিন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। ওই সময় সেখানে আমাদের এক জুনিয়ারের দাদা ডাক্তারি পড়াশুনা করছিলেন। তিনি আমার সুচিকিৎসার সব ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার দুঃখ হচ্ছে তাঁর নামটা মনে নেই। কিন্তু, আমি সেই ঘটনার কথা কোনোদিনই ভুলতে পারিনি। অনেকটা সুস্থ হ'য়ে হোস্টেলে ফিরতে হল, কারণ পাস কোর্সের ইংরাজি পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা দিচ্ছি। বাইরে বসে আছে একরামুল ওষুধ নিয়ে। এক ঘন্টা অন্তর সম্ভবত অ্যাট্রোপিনসালফেট এবং জেন্টিসিন নামের দুটি ড্রপ চোখে দিতে হতো। এই স্মৃতি কি কখনো ভোলা যায়! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেসময় অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে ইংরাজি অনার্স তো দূরের কথা বিএ-তে কম্বিনেশন সাবজেক্ট হিসেবেও ইংরাজি ছিল না। তখন কিছু দিনের জন্য অধ্যাপক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলেজের ইনচার্জে ছিলেন। আমি বাংলার সাথে ইংরাজিকেও একটি বিষয় হিসেবে রাখতে চেয়েছিলাম। উনি ছিলেন ইংরাজির অধ্যাপক। আমার ইচ্ছের কথাটা ওনাকে জানালে উনি বললেন কয়েকজন ছাত্রছাত্রী যদি একটি কম্বিনেশন সাবজেক্ট হিসেবে ইংরাজি রাখতে রাজি হয় তাহলে পড়ানো যেতে পারে। আমি উদ্যোগ নিলাম। ছবি সরকার, মালা ভাটিয়া, সাদেক আলি বিশ্বাস সহ আরো দু' চারজনকে রাজি করালাম। ইংরাজি পড়ানো শুরু হয়েছিল সেই থেকে। আরও একটি ব্যাপার ছিল। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ম্যাগাজিন ফী বাবদ অর্থ নেওয়া হলেও কোনো ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হত না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমার এবং ছবির সম্পাদনায় কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। বাংলা বিভাগের প্রধান ব্রহ্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান সম্পাদক।

একবার সরস্বতী পুজোর সময় ঠিক হল আমাকে এবং পলাশকে পুজো করতে হবে। আমি তন্ত্রধারক আর পলাশ পুরোহিত। তখন হোস্টেলের সরস্বতী পুজো হতো জাঁকজমক করে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং অধ্যাপকদের অনেকেই আসতেন আমাদের পুজো দেখতে। মনে আছে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ম্যাথামেটিক্সের অধ্যাপক স্বর্গত আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, মানে তিনুদা আমাদের পুজো দেখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মণিরুল হোসেন খুব ভালো ক্রিকেট খেলতে পারত। আমার ছোট্ট শহর আমোদপুরে একক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে মণিকে একজন প্রতিযোগি হিসেবে অংশগ্রহণ করানো হয়েছিল আমার উদ্যোগে। ওর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সকলকে অবাক করেছিল। ফলস্বরূপ ও জিতেছিল প্রথম পুরষ্কার। চন্দনের উদ্যোগে হোস্টেলের পক্ষ থেকে আমরা উখড়াতেও ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে গেছি হইহুল্লোড় করে। এই রকম কত ঘটনার কথা আজ মনের পর্দায় একের পর এক ভেসে উঠছে। কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততা এবং 'আনন্দদীপ'-এর পরিসর স্বল্পতার কারণে তার সবটাই তুলে ধরা সম্ভব নয়।

আমাদের সময়ে এবং তারও পর বহু বছর পর্যন্ত সত্যানন্দ ছাত্রাবাস বেশ জমজমাট ছিল। কিন্তু তার পর ধীরে ধীরে কেমন যেন ছাত্রাবাসে আবাসিকদের সংখ্যা কমতে লাগল। তখন উত্তরবঙ্গের জেলা মালদা, দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ থেকে অনেক ছাত্র সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে থেকে অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসত। এখন ওই সব জেলায় কলেজের সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এখন আর তেমন সংখ্যায় আসে না। তাছাড়া হোস্টেলের পরিকাঠামোগত কোনো আকর্ষণীয় পরিবর্তনও করার কোনো উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে বলেও মনে হয় না। ফলে ছাত্ররা এই রকম জৌলুসহীন ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করার আকর্ষণ ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে। আরো নানান কারণ হয়ত অবশ্যই আছে। তবে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের পূর্ব গরিমা আবার পুনরুদ্ধার হোক এই আশা ব্যক্ত করি। ফুলে ফলে ভরে উঠুক সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের বাগিচা আবারও স্বমহিমায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ না করলে বোধহয় পূর্ব স্মৃতিরোমন্থনের এই খণ্ডচিত্রের প্রতিভাসে অনেকটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তন আবাসিকরা কখনই সব সময় নিজেদের নিয়ে বিব্রত থাকেনি, আর তাই আজও সবার কথা ভাবে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে অনেককেই কখনো কখনো

আর্থিক সংকট বা অস্বচ্ছলতার শিকার হতে হয়। বিগত অতিমারী করোনা সংকটকালে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীদের এই গ্রুপ, আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য খুবই টানাপোড়েনের শিকার হতে হয়েছে, তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে একটি সহয়তা তহবিল গড়ার মত একটি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। আমার জুনিয়র প্রসূন ঘোষ আমার দুরবস্থার কথা একটু বেশিই জানত, সাদেক এবং নিজামের মতো। হঠাৎ করে আমার কাজ চলে যায়। স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে আমি মহাসংকটে পড়ে যাই। তখন এই তহবিল গড়ার সুসংবাদটি একদিন প্রসূন আমাকে জানায়। পরবর্তীকালে আমার ব্যাচের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে এবং গ্রুপগতভাবে আমাকে কিছুটা সহায়তা করার ফলে আমি অনেকটাই ধাতস্থ হ'তে পারি। আজ এই সুযোগে তাদের সবাইকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। জানিনা এটা উল্লেখ করা শোভনীয় হলো কি না, কিন্তু আমি আমার বিবেকের কাছে একশো শতাংশ দায়বদ্ধ, তাকে অস্বীকার করতে পারি না। হয়ত আমার মতো অনেকেই এই সুযোগ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছে।

এই ধরণের মহৎ কাজে ব্রতী হলেই তো কবি কামিনী রায়ের কবিতার ছত্রগুলির মর্মার্থ ছত্রভঙ্গ হয় না। তিনি বলেছেন ''আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে / আসে নাই কেহ অবনী পরে / সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।''

'আনন্দদীপ' অনির্বাপিত থেকে আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে অন্তরের অন্ধকারকে নাশ করুক। এই আশা রেখে বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণময় যুগের অবিসংবাদিত স্বর্ণকণ্ঠের শিল্পী স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের (গীতিকার স্বর্গীয় গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার) দুটি ছত্র দিয়ে আমার কলমকে বিরাম দিচ্ছি—

''মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে
স্মৃতি যেন হৃদয়ের বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে''।

স্মৃতিমেদুর

সন্দীপ দাস

প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৭

ছোটবেলায় আমার শরীর ছিল রোগা ল্যাকপেকে। বাবার চাকরিসূত্রে থাকতাম রেল কোয়ার্টারে। রেল কলোনীতে আমার নাম ছিল তালপাতার সেপাই। তা এ হেন শরীর নিয়ে আর সঙ্গে সারা বছরের সঙ্গী বিভিন্ন রোগে ভুগে বেড়ে উঠছিলাম আমি। ভালই ছিলাম। সমস্যাটা হলো ক্লাস টেনে ওঠার পর। বর্ষার জল পড়ে পুই শাক যেভাবে লকলকিয়ে ওঠে, আমার অবস্থা হল সেরকম। লম্বায় চওড়ায় রীতিমত সাবালক হয়ে উঠলাম। ঠোঁটের ওপরে হাল্কা গোঁফের রেখা। নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হতে লাগলো।

ক্লাস ইলেভেনে পড়ি। দিদির বিয়ে হল। যাচ্ছি দিদির শ্বশুরবাড়ি। একাই যাচ্ছি। এই প্রথম ট্রেনে চড়ে একা একা ভ্রমণ। স্টেশনের বুক স্টল থেকে একটা ম্যাগাজিন কিনে ট্রেনের জানালার ধারে বসে বেশ কায়দা করে ম্যাগাজিনটা মুখের সামনে ধরে আছি। নজর কিন্তু কামরার ভিতরে বিভিন্ন লোকের উপর। কেউ কি বুঝতে পারছে যে আমি এখনও নাবালকের গণ্ডি ছাড়াইনি!! উল্টো দিকে এক ভদ্রমহিলা একটি বাচ্চা কোলে বসে ছিলেন। আমি বাচ্চাটার দিকে একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ হাসি দিলাম। বাচ্চাটা ঘাবড়ে গিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকালো। মা হেসে বললেন ''ভয় পাচ্ছিস কেন? জ্যেঠু তো! তোকে আদর করবে, তাই ডাকছে''। এরপর গোটা রাস্তা আর ম্যাগাজিন মুখের সামনে থেকে নামাইনি।

এরপরে টুয়েলভ পাস করে ভর্তি হলাম কলেজে। সাঁইথিয়া শহরের অভেদানন্দ কলেজে। থাকতাম সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে কলেজ। আর কলেজের পিছনে ছাত্রাবাস। প্রথমদিন গেলাম হোস্টেল দেখতে। ভর্তি হয়ে গেছি। একবার দেখে এসে পরের দিন বাক্স-প্যাটরা নিয়ে আসবো, এই ছিল বাসনা। কলেজের পিছনে বিশাল খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে হোস্টেল। দোতলা। মাঠ পেরোলেই হোস্টেলের সারি সারি জানালা। সামনের একটু অংশ বাড়ানো। খোলা ছাদের নিচে ছোট্ট একটা পোর্টিকো। সেখানে পা দিতেই একজন হাফ প্যান্ট পরা রোগাসোগা লোক বেরিয়ে এল। মুখ খুলতেই বুঝলাম চেহারার সঙ্গে গলার একেবারেই মিল নেই। বেশ মোটা গলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ক্যান্ডিডেট আসেনি?' আমি হতভম্ব। বলে কি!! সেই মানুষটি, পরে জেনেছি নাম নিতাইদা, আমাকে বললেন 'আরে বাবা, আপনার ভাইপো না ভাগ্নে? কে থাকবে?' আমি ভয়ে ভয়ে বললাম 'আমি'। নিতাইদা বলে উঠলেন 'সে কি !! কতবারে পাস করেছো?' আমার তো তখন ধরণী দ্বিধা হও গোছের অবস্থা। বড়সড় চেহারার গর্ব ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। কোনো রকমে বললাম 'একবারই পরীক্ষা দিয়েছি, একবারেই পাস করেছি আর আমার চেহারাটাই এরকম।' শুনে নিতাইদার বোধহয় দয়া হলো। সাথে করে নিয়ে গিয়ে প্রিফেক্ট কল্যাণদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিন জিনিসপত্র নিয়ে ঢুকলাম ছাত্রাবাসে।

হোস্টেলে আমার নামকরণ হলো 'ম্যান'। আমি নাকি ছাত্রসুলভ অবস্থা কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ চেহারা প্রাপ্ত। তাই এ হেন নামকরণ।

একদিন কলেজ থেকে ফিরছিলাম বাড়ি। সঙ্গে আর এক বন্ধু। আমাদের স্টেশনেই নেমে সে যাবে গ্রামের দিকে। তখন ট্রেনে চড়লে আমরা কেউ টিকিট কাটতাম না। টিটিই উঠে টিকিট চাইলে আমরা বলে উঠতাম 'স্টুডেন্ট'। আর টিটিই কাকুরাও হেসে চলে যেতেন। তা সেদিন ট্রেনে উঠে আমার বন্ধু একটা বসার জায়গা পেয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি তার সামনে। এমন সময় টিকিট পরীক্ষক উঠলেন। উঠেই আমার বন্ধুকে টিকিট চাইলেন।

আমার বন্ধু যথারীতি বলল 'স্টুডেন্ট'। কিন্তু ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন। বললেন ''স্টুডেন্ট বলে বিনা টিকিটে যাচ্ছ সেটা ঠিক আছে। তাই বলে সিটে বসে যাবে !! যাও উঠে গিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'' এরপরে উনি আমাকে বললেন 'আপনি বসুন'। আমার কাছে টিকিট দেখতেও চাইলেন না। বাকি রাস্তাটা আমি ভ্যাবলার মতো বসে থাকলাম।

এতো গেল বাইরের কথা। হোস্টেলের মধ্যে ঘোষালদা, আমাদের হেড রাঁধুনি আমার নামকরণ করলেন শুভেন্দুদা বা ছোট শুভেন্দুদা। জানলাম যে শুভেন্দুদা নামে একজন সিনিয়র ছাত্রাবাসী (শব্দটা বোধহয় শুদ্ধ নয়, তবে এটাই মনে এল) আমার মতোই শারীরিক আকারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই এই নাম। (শুভেন্দুদা এখন স্বর্গবাসী, আমাকে ক্ষমা কোরো দাদা)। যাই হোক, এই দুই নামে পরিচিত হয়ে জীবন চলতে থাকল।

আমাদের এক মালদার বন্ধু, একসঙ্গে একদিন খেতে বসেছি। হঠাৎ সে বলে উঠল 'ঠাকুর একটু জুল দাও।' দিলীপদা, আমাদের আর একজন রাঁধুনি, তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল নিয়ে হাজির। বন্ধু তো ক্ষেপে অস্থির। পরে বোঝা গেল সে নাকি ঝোল চেয়েছে। মাছের ঝোল। কি বিড়ম্বনা!!

সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল বর্ষার রাতে লাস্ট ব্যাচে খেতে যাওয়া। খাবারে কখন কি ঢুকে পড়ত কেও জানে না। একদিন এরকমই খেতে বসেছি। ভাত, ডাল আর আলু সয়াবিনের তরকারি। আমার পাতে দেখি একটু লম্বা আকারের সয়াবিন। তারপর ভালো করে দেখি—ও হরি!! এতো একটা নেংটি ইঁদুর!! পরিণাম পরের খাবারটা অপূর্ব স্বাদের। গরম ভাত, গরম মুসুরি ডাল আর আলুভাতে। সে স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

এরকম আরও অনেক গল্প। সে বোধহয় কোনোদিন শেষ হওয়ার নয়। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সময়ে এরকম অনেক মণিমুক্তো স্মৃতির কোঠায় জমা হয়ে আছে।

ভালোবাসার ছাত্রাবাস

তুষার মণ্ডল
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৮

দিনটা ছিল ১৮ সেপ্টেম্বর, সাল ১৯৮৮। বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন। সন্ধ্যে ৭.২০ মিঃ আপ ময়ূরাক্ষী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার-এ চেপে বসলাম। গন্তব্য সাঁইথিয়া। সঙ্গে আমার লোকাল গার্জেন আকাশদা আর বোলপুরের প্রকাশদা। ট্রেনে বাকি যাত্রীদের সঙ্গে ছিল অসংখ্য ঢাকী। যারা বিশ্বকর্মা পুজোর বাদ্যি বাজিয়ে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করে ফিরে যাচ্ছে নিজ বাসভূম বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে। অবশেষে রাত্রি সাড়ে দশটায় সাঁইথিয়া। এগারোটায় সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। স্বভাবে একটু শান্ত প্রকৃতির হলেও ভয় বলে বস্তুটি আমার খুব একটা ছিল না। স্বভাবতই হোস্টেলে এসেও প্রথমে আমার খারাপ লাগেনি, বিশেষত আকাশদা যেখানে সঙ্গে ছিল।

আমার ব্যাচ মেটদের মধ্যে আমি প্রথম দিকে হোস্টেলে এসেছিলাম। প্রথম দুদিন তো কেউ কথাই বলছিল না, কারণ দাদাদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারা হয়নি। তখন একটু একা লাগত। এরপর শুরু হলো পরিচয়ে পর্বের পালা। তবে এই পর্বে এসে আমাকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম এবং পরবর্তীকালে দাদাদের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছিলাম।

এই সময়ে একটা অঘটন ঘটে গিয়েছিল হস্টেলে। এই পরিচয় পর্বে আমার সঙ্গে আরও দু'তিন জন ছিল আমারই ব্যাচ মেট। তাদের মধ্যে থেকেই দু'জন হস্টেল সুপারকে অভিযোগ জানায় কয়েকজন দাদার নাম করে। এ কাজ তারা কেন করলো, আমি আজও বুঝতে পারিনি। ওই সময় তো আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। অভিযোগ জানানোর মতো এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি সেদিন। অভিযোগ জানানোর ফলে যা হওয়ার তাই হলো। এসব করে কার কি লাভ হয়েছিল জানি না, তবে সেই দাদাদের জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল।

আমি হয়তো ভাষায় বোঝাতে পারবো না, তাছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরাও অনেক মলিন হয়ে গেছে। সেদিন দেখেছিলাম হোস্টেলে আবাসিক দাদাদের অন্তরিকতা, আবেগ, ভালোবাসা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। দুদিন আগেও যে হোস্টেল সবসময় এত সরগরম ছিল, আজ সেখানে এক চাপা নিস্তব্ধতা। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, প্রিয়জন বিয়োগের এক বিষাদভরা ছবি। ঠিক যেন একটা যৌথ পরিবার। এক বছরের পরিচয়ে যে একে অপরকে এভাবে আপন করে নিতে পারে, সেদিনের ঘটনার পরে আমি বুঝেছিলাম, এবং তখন থেকেই ধীরে ধীরে হোস্টেলের প্রতি আমার ভালোবাসা তৈরি হতে শুরু করে।

পরবর্তীকালে দেখেছি ছাত্রাবস্থায় যারা হোস্টেল জীবন কাটিয়েছে তারা তুলনামূলক অনেকটাই মুক্তমনা। মানুষের পাশে থাকে। 'আমার' থেকে 'আমাদের'-কে বেশি প্রাধান্য দেয়।

এখনও হোস্টেলের কোনো দাদা, ভাই বা বন্ধুর সঙ্গে কথা হলে তিরিশ বছর আগের হোস্টেলের সেই সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার দিনগুলোই চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভাসে।

যারা ছাত্রাবস্থায় হোস্টেল জীবন কাটায়নি, তাদের জীবনে মনে হয় একটা অধ্যায় বাকি থেকে গেছে।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস—এক অসমাপ্ত কাহিনি

শেখর মজুমদার

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৩

বন্ধু অনিমেষের অনুরোধে অনেকদিন পর কলম ধরলাম। আগে ডায়রি লেখার অভ্যেস ছিল। হয়ত ডায়রিতে আমার হোস্টেল প্রবেশের দিনটা আছে। কিন্তু সে ডায়রি আমার জন্মভূমি রাতগড়ায়, আর আমি কর্মক্ষেত্র কলকাতায়।

মনে পড়ে ১৯৯৩ এর আগস্ট মাসের কোনো এক স্যাঁতসেঁতে দিনে বাক্স নিয়ে রিক্সায় করে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে ঢুকেছিলাম। আগের দুই বছর সিউড়ি রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে পড়াকালীন মেসে জমজমাট কাটিয়ে এসে একটা পুরনো হোস্টেলে ঢুকে মনটা একটু দমে গেছিল। মেসের বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কষ্টটা তখনও ছিল প্রবলভাবে।

কলেজ ক্যাম্পাসের র‍্যাগিং বা ইন্ট্রোডাকশন হালকা ধরণের। এক দাদা হাতে ফুল তুলে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক দিদিকে দেখিয়ে বলল, 'যা প্রেম নিবেদন করে আয়।' আমি আগে নাটক যাত্রায় অভিনয় করেছিলাম। এগিয়ে গিয়ে নির্দ্বিধায় বলে দিলাম, 'দিদি, আমি তোমাকে ভালোবাসি'। দিদিও হেসে বলল, 'আচ্ছা যা।' সবার কপাল অবশ্য অত ভালো ছিল না।

এরপর হোস্টেলেও হয়েছিল নানান ইভেন্ট। প্রশ্নোত্তর, টেবিলের তলা থেকে মশা ধরা প্রতিযোগিতা, DD-১ এর ক্ল্যাসিক্যাল ডান্সের অনুকরণে নৃত্য—ইত্যাদি নানান লেভেল পেরিয়ে একসময় হোস্টেলে বসবাসের উপযুক্ত হলাম। তাও একমাস সিনিয়রদের সামনে মাথা নিচু করে চলতে হয়েছিল। চলতে চলতেই অনেক বন্ধু পেয়ে গেলাম—বাবলু, অনিমেষ, বিমল মোটু, বিমল শানু, অসিত, গৌতম, সুব্রত, নীলমণি, সুধীরঞ্জন, সুকল্যাণ এবং আরো অনেকে।

হোস্টেলে পড়াশোনা ছাড়াও খেলা, বিশেষ করে ক্রিকেটটা খুব হত। ফার্স্ট ইয়ার বনাম সেকেন্ড ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারের সঙ্গে থার্ড ইয়ারের ম্যাচ হত মাঝে মাঝে। হোস্টেলে লাইব্রেরি ছিল। তবে সেটা ব্যবহার করত গুটি কয়েক জন।

হোস্টেলে দুটো কমিটি ছিল, মেস কমিটি ও অডিট কমিটি। প্রতি মাসে মেস কমিটির দুইজন দায়িত্বে থাকত। তারা সারা মাসের খাবারের বিষয় দেখাশোনা করত—যেমন বাজার করা, সময়ে রান্না হচ্ছে কিনা দেখা, হিসেব রাখা। অডিট কমিটির কাজ ছিল নিরপেক্ষভাবে সারা মাসের হিসেব পরীক্ষা করা। অনিয়ম আটকাতে একজন দুই কমিটির মেম্বার হতে পারত না। আমি সেকেন্ড ইয়ারে এত পপুলার হই যে, আমাকে দুই কমিটিতেই রাখা হয়।

দল বেঁধে কলেজ যাওয়া, টিউশন যাওয়ায় বেশ আনন্দ ছিল। রবিবার বর্ধমান রাজ কলেজের প্রফেসর প্রমথেশবাবুর কাছে টিউশন পড়তাম আমরা। আমরা বলতে আমি, অনিমেষ, দুই বিমল। বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে যেতাম আর দানাপুরে ফিরতাম।

ডঃ কে ডি রায়ের বাড়ি একটা আশ্রম। আমি ও অনিমেষ মাঝে মাঝে যেতাম। ভাবতাম এই মহান মানুষটির কাছে যদি পড়তে পেতাম! তাঁকে না পেলেও পেয়েছিলাম তাঁর ছাত্রকে—এস পি কুইল্যা স্যার। খুব দরদ দিয়ে পড়াতেন। শ্যামলবাবুও খুব দরদী মানুষ ছিলেন। আমাদের কলেজের ল্যাব এবং লাইব্রেরি খুব ভালো ছিল। লাইব্রেরিতে বইয়ের সম্ভার ছিল দেখার মতো। ভালো ডিসিপ্লিন রক্ষা হতো, আর থাকত পিন-ড্রপ সাইলেন্স।

একটা ঘটনা মনে পড়ল, সম্ভবত মানবদার বোনের বিয়ে। আমরা কয়েকজন চলে গেলাম অনিমন্ত্রিত। শুধু অনিমন্ত্রিতই নয়, সেদিনের প্রবল বৃষ্টিতে কাদায় লুটোপুটি

করতে করতে আমরা শেষ পর্যন্ত হোস্ট হয়ে গিয়েছিলাম। বরযাত্রীদের সমস্ত বায়নাক্কা সামলে পরের দিন দুপুরের আহার করে সুনামের সঙ্গে হোস্টেলে ফিরেছিলাম।

বেশ চলছিল পড়াশোনা। ১৯৯৪ সালে হঠাৎ ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে চাকরি পেয়ে চলে গেলাম চাকরি করতে। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে মাত্র দেড় বছরের একটা অসমাপ্ত হোস্টেল জীবন রয়ে গেল।

তারপর বেশ কিছু ডিগ্রি চাকরিরত অবস্থায় করেছি। BA, MA, IGNOU থেকে Computing -এর একটা সার্টিফিকেট কোর্স, DGCA থেকে AME (Aeronautical Maintenance Engineering) ছাড়াও B.Tech ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেছি। এখন এয়ার ফোর্স থেকে রিটায়ার করে ব্যাংকে কর্মরত। আজকের দিনে যোগাযোগ, প্রযুক্তি, গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রত্যেকের ভাল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। বর্তমানে একজন কলেজ পড়ুয়া ছেলের বাবা হিসেবে আমার উপলব্ধি হচ্ছে, হতাশার কোনো জায়গা আজ নেই। যতই প্রতিযোগিতা থাক, ইচ্ছে আর জেদ থাকলে ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়। জীবন সুন্দর করার এই মন্ত্র সত্যানন্দ ছাত্রাবাসেই পাওয়া।

এখন মনে হয়, আমাদের সময়ে কলেজে সাইকোলজিক্যাল এবং কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা থাকলে আমরা সবাই উপকৃত হতাম। মূল্যবোধের ঠিকঠাক বিকাশ হতো। অন্তত আমার হোস্টেল জীবনটা হয়ত অসমাপ্ত থেকে যেত না।

এক অখণ্ড অবিরাম শক্তিময় স্রোতধারা...

অনিমেষ মণ্ডল

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৩

একদিন একটা আস্ত আকাশ আমার সামনে মেলে ধরল তার বিপুল করতল। একটা সদ্য আঠারোর ছেলে এই বিপুল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বিহ্বলতায় পরিপূর্ণ। এভাবে তো আগে কখনও ভাবেনি সে। এত মুক্তি হাওয়ায় হাওয়ায়, ঘাসে ঘাসে! এ কোন প্রভাত, তুমি আমার জন্য সাজিয়ে রেখেছ অমল আলো! এক সদ্য কিশোর আনন্দে আত্মহারা। অথচ সে পিছনে ফেলে এসেছে তার পরিবার। প্রিয়তম মুখের মিছিল ফেলে অচেনা অজানা এক জগতের ধূসর গলিতে সদা চঞ্চল এক হরিণের মতো তার বিচরণ। তবু মন বলছে কম তো পড়েনি কোথাও, বরং যা ছিল না সেই অধরাকে ছোঁয়ার আনন্দে এই মন উদ্বেলিত, ভাষাহীন। আর যা ছিল তাও যেন ফিরে এসেছে অন্যরূপে। নব আনন্দে জেগে উঠবার এক অপরূপ আয়োজন আজ পূর্ণ করে প্রাচীন অশ্বত্থের মতো বসে আছে আমার, আমাদের সকলের নয়নমণি সত্যানন্দ ছাত্রাবাস।

মফস্বলের এক গ্রাম্য বালক একদিন কলকাতার কয়েকটি কলেজ ঘুরে যখন একরাশ হতাশা আর বিষণ্ণতায় ডুবে যেতে যেতে চলে এসেছিল ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা এক গ্রামীণ জনপদের এক ছোট্ট কলেজে, যে কলেজ তাকে পরবর্তীতে দিয়েছে এক বিরাট প্রসার, তার মনুষ্যত্বের বোধ ও বোধিকে ধীরে করেছে উদ্ভাসিত তার নাম সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়। কারণ এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির সুবাদে ঢুকে পড়েছিলাম বহমান ময়ূরাক্ষীর তীরে আমাদের স্বপ্নের আশ্রয়ভূমি সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে। সেদিনই এক বিপুল আকাশ এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি তার বিশালত্বের কাছে নতজানু। সেই মুহূর্ত থেকেই একটি মাটির তাল ধীরে ধীরে অবয়ব পেতে শুরু করল। যা কিছু তার নিজের, যে ঐশ্বর্য তার আপন তাই দিয়ে সে গড়ে তুলতে লাগল বোধ ও বিবেচনার এক প্রসারিত দিগন্ত। আর নেপথ্যে যারা একটু একটু করে মাটি লাগিয়ে, রং লাগিয়ে, রাংতার সাজ লাগিয়ে মূর্তিকে আরো মহিমান্বিত করে তুলেছিল তারা আমারই আশপাশে বেড়ে ওঠা আমারই মতো বন্ধুজন, অথবা অগ্রজ বা অনুজের এক বিদ্যুৎশানিত সাহচর্য। এইসব সঙ্গসুধা একদিন ভাষা পেল, সুর পেল তারপর এক রঙিন পালকের মতো চিরদিনের এ গান হয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল, সেই থেকে তাকে খুঁজছি তো খুঁজছিই.....

একদিন রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের টালির ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম আরো বৃহত্তর এক জগতের অমোঘ হাতছানিতে। সেই স্কুলের মাঠ, চিরপরিচিত বালকের দল, স্যারেদের অতুলনীয় স্নেহ আর শাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে আর একটু যখন বড় হলাম তখনই যার কোলে আশ্রয় পেলাম সে আমাদের প্রিয় হোস্টেল। একটা মনখারাপ, একটা ভয়, একটা উৎকণ্ঠাকে অতিক্রম করে যখন ধীরে ধীরে তার প্রেমে পড়ছি তখন বুঝতে শিখলাম জীবন অনেক বড়। অনেক কিছু করার একটা শপথ ধীরে ধীরে মনের গভীরে গ্রথিত করছে শিকড়। ফিজিক্সকে ভালোবেসে জেদ করে পড়তে এসেছি ফিজিক্স অনার্স। বুঝতে পারছি কোথাও একটা নিজের কাছে হেরে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। বাবার দুরারোগ্য স্নায়বিক ব্যাধি, কবিতার বিষাক্ত ছোবল ক্রমশ গ্রাস করছে আমার মস্তিষ্কের ধূসরজগত। তবু হার মানিনি সেদিন। ভেঙে পড়ে বেছে নিইনি আত্মহত্যার পথ। সে তো শুধু হোস্টেলের সৌজন্যেই। ভালোবাসার এমন অপার সমুদ্র এক জীবনে কে আর পেয়েছে কোথায়! সেইসব অক্ষয় ভালোবাসা ফুল হয়ে ফুটে আছে কত কত নামে নামে— বিকাশ, বিমল (শানু), বিমল (মোটা),

সুমন, অসিত,শেখর, সুধী, সুনির্মল, সুব্রত, কালি, বাবলু, হৃদয়, মানব,নীলমণি, বিপ্রদাসদা, সুজিতদা, গণেশদা, পার্থদা, হলধরদা,ষষ্ঠীদা, সুব্রতদা (নিউবিল্ডিং), মোশারফদা, যতীনদা, তুষার,আউলাদ, কুণাল, কাজল, তরুণ, সোমনাথ, সুরজিৎ,পলাশ, পার্থ (ভাল্লুক), সেমিম, প্রিয়, চন্দন, আরিফ মুন্না,এটিএম রাজা, সবুর, বুবুল, মলয় এমনি কত কত ফুলের সৌরভ ভরে দিয়েছিল আমার সব অপূর্ণতা। আজ তার কিছুটা হয়ত বিস্মৃতির অতলান্তে। ক্ষমা কোরো হে প্রাচীন জটাজুট সময়। যেসব নাম আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না তারাও রয়েছে দূরের নক্ষত্রের আলো হয়ে।

তারপর একদিন ১৯৯৬-এ থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে বেরিয়ে গেল প্রথম কবিতার বই 'ভারতবর্ষ কোনোদিন জানবে না'। দোতলার ৩৯ নম্বর ঘরে বসে তুষারকে শোনাতাম বাংলাদেশের কবি রুদ্র মহম্মদ শহীদুল্লাহের কবিতা। ওই একদিন বলল তুই তাহলে 'অনিকেত রুদ্র' হয়ে যা। প্রথম বই বেরল অনিকেত রুদ্র ছদ্মনামে। আকারে কৃশকায়, পাতলা মলাট। তবু হোক সে রোগা, জীর্ণ কিন্তু 'ভারতবর্ষ কোনোদিন জানবে না' একটি স্বপ্নের নাম। এই স্বপ্ন দেখতে আমাকে স্পর্ধা দেখিয়েছিল সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। একদিন ইস্তাহারের মতো আমার বই হোস্টেলের বন্ধুদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। আমার আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে দেবদারু বৃক্ষের ঋজুতায় বলিষ্ঠ হয়ে উঠল। বন্ধুদের ভালোবাসা কত কত জীবনকে মহীয়ান করে তোলে তা আমাদের হোস্টেলের ইঁট, কাঠ, কড়িবরগায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে অমলিন।

মাঝে মাঝে হোস্টেলকে আমার মনে হত ভারতবর্ষ। এত কিছুর সংমিশ্রণ ঘটেছে এই ছোট্ট ভূখণ্ডে অথচ সব প্রাণ যেন একসুরে বাঁধা। সেই সুর একতার সুর, নিঃশর্ত ভালোবাসার সুর। প্রতি বছর ফেয়ারওয়েলের দিন যখন তিন ও দুই নম্বর রুমের সামনে মঞ্চ বেঁধে অনুষ্ঠান হত, সকাল থেকে মাইকে বাজত রবীন্দ্রসংগীত, এক অদ্ভুত ভালোলাগায় মন ভরে যেত। সেদিন আমার হোস্টেল সেজে উঠত অপরূপ শোভায়। সারাবছরের একঘেয়েমি যেন এক নিমেষে কোথায় চলে যেত। কলেজের অধিকাংশ স্যারেরা, ছাত্রছাত্রীরা সবাই আসত। ভাস্কর কয়েরী স্যারের উদ্বোধনী সংগীত। বিজয়দার উদাত্ত কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ছেলেমেয়েদের গান, ক্যুইজ সব মিলিয়ে একটা মিলনক্ষেত্র। এরকমই একটা অনুষ্ঠানে ফার্স্ট ইয়ারের শেষে একদিন জোর করে মাইক ধরিয়ে দিল আমার বন্ধু রঘুনাথগঞ্জের বিমল। সেই থেকে যতদিন হোস্টেলে ছিলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালনা আমাকে পিছু ছাড়েনি। আজও আমার অনেক বন্ধু আমাকে সঞ্চালক বলেই জানে। এই জীবন তো হোস্টেলের সৌজন্যে পাওয়া।

একটা পরম্পরা দেখেছিলাম একদিন; দুর্গাপুরের দেবুদা, অর্জুনদা, সুজিতদা হয়ে সুধীরঞ্জন। তারপর একদিন আমি নিজেই ঢুকে পড়লাম সময়ের বহমানতায়। নির্বাচিত প্রিফেক্ট (১৯৯৬-৯৭) হিসেবে একটি বৃহত্তর পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ল আমার উপর। সেইদিন সত্যি সত্যিই যেন অনেকটা বড় হয়ে গেলাম। এতবড় একটা সংসারের দেখভালের দায়িত্ব মানুষ হিসেবে আমাকে পরিবর্ধিত জীবনে অনেকটাই সাহায্য করেছে। সেই সব অকৃপণ শিক্ষার কাছে আমি ভীষণ রকমের ঋণী। এই ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়। আমি তা চাইও না। ঋণে ঋণে বোঝা বাড়ুক আমার। সেই অনন্ত ঋণের বোঝার ভার আমি যেন কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরণ বহন করে যেতে পারি। পতাকা যখন দিয়েছিলে একদিন তখন আজীবন শক্তি দিও বহিবার হে মহিমময়। সেইসব গৌরবের রৌদ্রকিরণ আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বাজে এক চিরকালের সংগীতের মতো।

আর ছিল আমাদের ডাইনিং। পাভলভের পরীক্ষায় আমরা কোনোদিন উত্তীর্ণ হতে পারিনি। রাত্রি নটার ঘন্টা বাজলে লালারসের উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। অর্জুনদা, পার্থদা, মঙ্গলদার হাতের থালা ঘুরতে থাকত শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের মতো। অনেক চেষ্টা করেও যা আমি কোনোদিন নকল করতে পারিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন রণসাজে সজ্জিত ঘোষালদা, দিলীপদা, বিশুদা, নিতাইদা, ডালিম আর ট্যাম্পা। অস্ত্র গরম ভাত, ডাল, অমোঘ ডিনামাইট আর থালাভর্তি জ্বালাময়ী লঙ্কার ঝাঁঝ। এসবের মাঝে যে কত উদ্বেল আনন্দের ঢেউ আমাদের সতত প্লাবিত করত তার হিসাব অন্তরের অলিন্দে লেখা আছে।

রাত্রি নিঝুম হলে যখন সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের ছাদের উপর কিছুটা ঝুঁকে পড়ত অলৌকিক চাঁদ, নিশুতির মায়াবিনী ময়ূরাক্ষীর চর জ্যোৎস্নায় ভেসে যেত অবিরাম

ঠিক তখনই খুব একা বোধ হলে উঠি আসতাম ছাদে। চারিদিকে একটানা জোনাকির ঝিঁঝি। আলোয় আলো হয়ে ভেসে যাচ্ছে সত্যানন্দের আকাশ। সারাদিন কোলাহলের মাঝে নিজেকে চিনতে পারতাম না। কিন্তু সেই নিশুতির নিভৃতে মনে হতো একজীবনের যত পরাজয় সব ধুয়ে যাচ্ছে অলৌকিক জ্যোৎস্নায়। এক পরিপূর্ণ মানুষের পরিচয় নিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি আগামীর পথে। হয়তো কিছুটা পাবো, কিছুটা পাবো না। পাওয়া আর না পাওয়ার আনন্দ-বেদনার ঘনঘোরে ডুবে থাকবে একটি অমলিন জীবন। জোনাকির বিন্দুর মতো তারা ক্রমান্বয়ে জ্বলে আর নেভে। যেভাবে একটি মানবজীবন আলো আর অন্ধকারের মাঝে চিরকাল দিশা খোঁজে। যেভাবে মহাজাগতিক কণারা বারবার সংঘর্ষে বিলুপ্ত হয়ে যায় আর তার রূপান্তরিত সব শক্তি বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন। এই মৃত্যু আর তার বিনির্মাণ সভ্যতার স্রোতকে চিরজাগরুক রাখে। একদিন সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের আকাশ আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল আমিও সেই অখণ্ড, অবিরাম, শক্তিময় স্রোতধারার অবিচ্ছিন্ন অংশ ব্যতীত অন্য কিছু নই। ধূলিধূসরিত জীবনের পথে এইটুকু আমার আজন্মের পরিচয়।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, সেবাপরায়ণতা এবং এক প্রকৃত পূজার নিদর্শন

সুমন চক্রবর্তী
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৩

‘যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে....’

প্রবহমানতার নামই জীবন! থেমে যাওয়া মৃত্যুর সামিল। একই উৎপত্তিস্থল থেকে একাধিক নদী উৎপন্ন হলেও সব নদী সাগরে গিয়ে পড়ে না। সাফল্য অসাফল্যের কোনও তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে সব পথ একই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। এমনটাই মনে হল এই অনেকটা ফেলে আসা জীবনের পিছনে তাকাতে গিয়ে। সেই অতীতচারিতার মধ্যে যেটুকু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তা আমাদের সকলের প্রিয়তম সত্যানন্দ ছাত্রাবাস। একই জায়গায় থেকেও হয়তো আমাদের প্রত্যেকের জীবন আলাদা কিন্তু জীবনে কি পেয়েছি আর কি পাইনি এই হিসাব যখন করতে বসি তখন দেখি যা পেয়েছি তা হারানোর থেকে কোনও অংশে কম নয়। এই উপলব্ধিটাই আজ হোস্টেল সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে মনের মণিকোঠায় ঘুরে ফিরে আসছে বারবার।

একদিন সুদূর দুর্গাপুর থেকে ফিজিক্স অনার্স পড়ব বলে ভর্তি হয়েছিলাম সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে। সেই হিসেবেই সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের দ্বারস্থ হই। আমারই বয়সের কত কত বন্ধুজন সেদিন ঘিরে রেখেছিল আমাদের সবাইকে। সুখে দুঃখে কত কত মুহূর্ত আমরা নিজেদের মধ্যে উদযাপন করেছি সেসব কথা আজকে ভাবতে বসলে খুব রোমাঞ্চ লাগে। সেকেন্ড ইয়ারের দাদাদের অভ্যর্থনা সেদিন আমাদের কাছে খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না কারণ কিছুটা জেনেই এসেছিলাম। তবু প্রাথমিকভাবে একটু মনখারাপ থাকলেও পরে পুরোটাই চুটিয়ে উপভোগ করেছি। মনে হয়েছে এতদিনে যেন অভিভাবকবিহীন হয়ে কিছুটা মানুষ হতে পারলাম। সেই ডাইনিং হল, খেলার মাঠ, ঘোষালদার ঘোলাটে চোখ, দোতলার উপর থেকে থালা ছুঁড়ে নিচে ফেলা, নিতাইদার মাথায় নারকেলের পতন, ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান, বিকেলের ভলি—সব মিলিয়ে একটা যেন জমজমাট পরিবেশ। এত আনন্দ আয়োজন ছড়ানো ছিল চারপাশে যে মনখারাপগুলো ভেসে যেত কোনদিকে।

এভাবেই বেশ চলছিল বছরগুলো। প্রতি বছর আবার একদল সদ্য যুবক ঢুকে পড়ে হোস্টেলে। তাদের গল্প শুনতে শুনতে হু হু করে কেটে যায় সময়। আমাদের ফিজিক্স ব্যাচের প্রত্যেকের সঙ্গে ততদিনে গড়ে উঠেছে নিবিড় বন্ধুত্ব। বিমল (পাল), বিমল (চৌধুরী), অসিত, বিকাশ, অনিমেষ, শেখর, গৌতম, অভিজিৎ। এদের মধ্যে অভিজিৎ আর শেখর কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেছে অন্য স্ট্রীমে। বাকি যারা রইল তারাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রথম বছর পরীক্ষা দিল মাত্র দুজন। বিমল আর গৌতম। আমরা যারা রইলাম সবাই ড্রপ। ফলে কিছুটা হতাশা আর ব্যর্থতার গ্লানি আমাদের চেপে ধরে। তবুও সেসব দিন অনায়াসে পার করেছি সকলের ভালোবাসায়।

তারপর একদিন সময়ের নিয়ম মেনেই হোস্টেলজীবন শেষ হল। ফিরে গেলাম যে যার ঘরে। সেখান থেকে আবার নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু। যেমনভাবে একটা ঢেউ মিলিয়ে যেতে না যেতেই এসে পড়ে আর একটি ঢেউ। কিন্তু আমার জীবনে আর নতুন কোনও ঢেউ আসেনি। দুর্গাপুরেই থেকে গেছি তারপর থেকে। জীবিকার জন্য

সেভাবে কিছু করা হয়নি বলে জীবন হয়ত আমাকে দিয়েছে এক নিস্তরঙ্গ আলোছায়া। আজ সব স্মৃতিগুলো যখন মনের গভীরে ঢেউ তোলে তখন অতীত ভেসে ওঠে জলছবির মতো।

এভাবেই সব কিছু হয়ত নিস্তরঙ্গ থেকে যেত আমার জীবনে। কিন্তু গতবছরের একটা ঘটনা আবার পুরনো সমস্ত স্মৃতিকে নতুন করে জাগিয়ে দিল। দীর্ঘদিন ধরেই আমি হাড়ের একটা সমস্যায় ভুগছিলাম। সমস্যা এতটাই বাড়াবাড়ি হয় যে অপারেশন করাবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। তা না হলে হয়ত ভবিষ্যতে পঙ্গু হতে হতো। এমতাবস্থায় আমি কলকাতার একটা বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হই অপারেশনের জন্য। পরে নার্সিংহোমের বিল দেখে যখন খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ি তখন কাছের কয়েকজনকে ফোন করি কিছু টাকা ধার চেয়ে। এর কিছুদিন পরেই আশ্চর্য হয়ে দেখতে পাই আমার নামে একটা গ্রুপ খোলা হয়েছে শুধুমাত্র আমাকে সাহায্য করা হবে বলে। সেখানে বিভিন্ন ইয়ারের সিনিয়র এবং জুনিয়ারেরাও হেল্প করতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই নার্সিংহোমে দেখা করতে আসে আমাদের হোস্টেলের এক সিনিয়র দাদা সন্দীপদা, জুনিয়র দুই ভাই তুষার ও রাজেশ। তারপরেও বুবুল, আকাশদা দেখা করতে এসেছিল। আর ফোনে খোঁজ নেয় হোস্টেলের অনেকে। যার ফলে সে যাত্রা আমি খুব ভালোভাবেই রেহাই পাই। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এরপর আরো একটা বড় অপারেশন (কোমরের) করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় আমি দিল্লি এইমস-এ যাবার সুযোগ পাই এবং সেখানে আমার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেয় আমার বন্ধু সুধীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ওর কিছু সহৃদয় পরিচিতের মাধ্যমে। ফলে আমার পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। আর আর্থিক ব্যাপারে আবার পাশে পাই আমার সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের দাদা, ভাই, বন্ধুদের। এইভাবে সকলের সহায়তায় আজ আমি সুস্থ জীবন যাপন করছি। এই ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়। সেদিন যদি প্রায় তিরিশ বছর পিছনে ফেলে আসা আমার কলেজের বন্ধুরা এবং সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের সকল প্রাক্তন আবাসিকবৃন্দ আমার পাশে না থাকত তবে আজ হয়ত আমি অন্ধকারময় একটা জীবন কাটাতাম।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারের মাথার উপর লেখা ছিল Be like a flower. স্বামী সত্যানন্দদেবের এই কথাটি কতটা সত্য তা আজ বেশ বুঝতে পারি। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের সকল আবাসিক হয়ত সফল জীবন পায়নি। তা পাওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু একটা কথা হলফ করে বলতে পারি যে, সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের সকল আবাসিক প্রকৃত মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে। তা না হলে একজন ব্যাক্তি মানুষের এমন বিপদের দিনে তারা কখনোই কাছে থাকতে পারত না। প্রাক্তনীদের এত বড় একটা গ্রুপ যে গড়ে উঠেছে তাতে আমরা সকল সময় যেন প্রকৃত কোনও বিপদগ্রস্তের পাশে প্রকৃত মানুষের মতো থাকতে পারি। তাই হোক স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের অন্যতম শিষ্য স্বামী সত্যানন্দদেবের প্রতি আমাদের সকল প্রাক্তনীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস : এক ক্রিকেট ক্যাপ্টেনের কলমে

তরুণ সাহা

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫

১৯৯৫ সাল। সবে হোস্টেলে এসেছি। হোস্টেলের মাঠে ম্যাচ চলছে। দাদারা সব খেলছে। রঘুনাথগঞ্জের বিমলদা কাকে যেন চিৎকার করে বলছে, 'ওরে কানা, যদি আটটা ক্যাচ মিস করিস তবে আর কি করে জিতবি?' বলতে বলতে আবার ক্যাচ উঠেছে, ওরে ধর ধর, যাঃ....।

'ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেগুলোকে কিছু নিতে হবে এবার', নিজের মনে গজগজ করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল বিমলদা, 'এই তোরা খেলতে পারিস?' আমরা যেন অপেক্ষাতেই ছিলাম। ঘাড় নাড়লাম।

'কাল তোদের সেকেন্ড ইয়ারের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে হবে।'

সে রাত্রে একটা ছোট্ট মিটিংয়ে তৈরি হয়েছিল ফার্স্ট ইয়ার নতুন টিম। ম্যাচের দিন সকালে মাঠ ঠিক করার জন্য আমাদের একটা রোলার ঠেলতে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা আমাদের খুব বিরক্তি লাগলেও ওয়ার্ম আপ হচ্ছিল। আমাদের একজন বলে উঠলো, 'আমার নাম অর্ণব চন্দ। আজ যদি তোদের হারাতে না পারি তবে...।' অথচ অর্ণব (বুবাই) কোনোদিন মাঠেই নামেনি। খেলেছিল ওর রুম-পার্টনার লয়েড। দুর্ধর্ষ কিপিং করেছিল। সেকেন্ড ইয়ারের দাদারা আগে ব্যাট করে একশো দশের মতো রান তুলেছিল। সুরজিৎ, সাহিন, পৃথ্বীশ, সোমনাথ ও বাকিরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। চন্দনদা ভালো খেলেছিল। ইনিংস ব্রেকের পর ইতিহাস রচনার শুরু। বুবুল আর আমি ওপেনিং করতে নেমে অপরাজিত থেকে ম্যাচটা জিতেছিলাম। সেদিন বুঝিনি, কিন্তু ওই ম্যাচটাই ছিল সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের ক্রিকেটে এক স্বর্ণযুগের শুরু।

১৯৯৬ সালে রাজদীপ, প্রদ্যুত এদের মতো এক ঝাঁক নতুন প্লেয়ার এসেছিল। হোস্টেলের মাঠে তখন ক্রিকেট, ভলি, ফুটবলের রমরমা। টিভি রুমে চলছে ক্যারাম, টেবিল টেনিস। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে হোস্টেলের খেলার পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলাম। জয়দা খেলার ব্যাপারে সমস্ত রকম সাহায্য করত। আমার দাদাও হোস্টেলে ছিল। সেই সুবাদে সুধীদা, অনিমেষদা, বাবলুদা খুব ভালোবাসত। পলাশদা, কুনালদা, চন্দনদা, সেমিমদা, কুমারদা, বসন্তদা, উদয়নদা এদের কাছে অপরিসীম ভালোবাসা পেয়েছি। পলাশদা ও কুনালদা তো আমার অনেক অন্যায় আবদারও সহ্য করতো। ১৯৯৭ সালে সাঁইথিয়া এবং আশপাশ অঞ্চলে ক্রিকেটের কোনো টুর্নামেন্ট হলে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের অংশগ্রহণ ছিল অবধারিত। প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে আমরা খুব ভালো পারফর্ম করতাম, কিন্তু প্রত্যেকবার ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারছিলাম না। তবে একটা ছোট-ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয়েছিল। সেখানে আমাদের হোস্টেল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সমস্ত ম্যাচে বুবুল আর রাজদীপ ওপেন করত। একমাত্র ফাইনাল ম্যাচের আগে ছাড়া ওদেরকে কেউ আউটই করতে পারেনি। ফাইনাল ম্যাচে ওরা দুজন যখন আউট হল, তখন চ্যাম্পিয়ন হতে আমাদের আর বেশি রানের দরকার নেই। বাকি কাজটা আমি আর আশু ('৯৬) মিলে শেষ করে দিয়েছিলাম।

১৯৯৮ সালে আবার এক ঝাঁক ভালো প্লেয়ার—মলয়, মানব, নূর, মৃদুল আরও অনেকে। এই বছর সত্যানন্দ ছাত্রাবাস প্রায় সব টুর্নামেন্টেই চ্যাম্পিয়ন। ফাইনাল ম্যাচগুলোতে আমিও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জন্য বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছিলাম। এই সময় আমাদের হোস্টেলের ক্যাপ্টেন ছিল রাজদীপ। কিন্তু ম্যাচের কোনো সিদ্ধান্ত রাজদীপ কিছুতেই নিত না। ম্যাচের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিতাম আমি। ও শুধু টস করতে যেত। রাজদীপ কখনও টসে হেরেছে এরকম আমার মনে পড়ছে না।

দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান ছিল, আমার সঙ্গে রাজদীপের বোঝাপড়া ছিল অসম্ভব রকমের ভালো।

বুবুল প্লেয়ার হিসেবে অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। প্রত্যেকবার ম্যাচের আগে আমাদের টিম মিটিং হত। বুবুলকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হত, এক কথায় রাজি। ওপেন সহ যে কোন পজিশনে যেমন খুশি ব্যাট করতে পারত। কিপিং, ফিল্ডিং, বোলিং যা দরকার—বুবুল আছে।

সাঁইথিয়া থেকে কুণ্ডলা যাওয়ার রাস্তায় একটা স্কুল ছিল। স্কুলের পেছনের মাঠে একটা টুর্নামেন্টে একটি ম্যাচে আমাদের অনেক ভালো প্লেয়ার উপস্থিত নেই। অনেক কম রানে আমাদের বেশ কিছু উইকেট পড়ে গেছে। এবার বুবুল নামবে, আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন কি করব?' বললাম, 'তুই গিয়ে চালা।' ওদের সেরা বোলারকে বুবুল এমন বিশাল একটা ছয় মারল যে ওরা চমকে গেল। সেটাই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল ওই ম্যাচের।

অমর ডান হাতে খুব জোরে বল করত, কিন্তু ব্যাট করত বাঁ হাতে। আর অফসাইডের বলে ভালো ব্যাট করতে না পারলেও লেগ সাইডের বলে খুব ভালো খেলত। একবার একটা ম্যাচে অল্প রানে আমাদের অনেকগুলো উইকেট পড়ে গেছে। সাত নম্বরে নেমে অমর লেগ সাইডে পরপর চার, ছয় মেরে আমাদের জিতিয়ে দিয়েছিল। বিপক্ষ যতক্ষণে বুঝতে পারে অফসাইডে বল করতে হবে ততক্ষণে ম্যাচ শেষ।

সাহিন বিপক্ষ টিমের দুর্বলতাগুলো ঠিক খুঁজে বের করে নিত। একবার একটা ম্যাচে আমরা প্রথমে ব্যাট করে অনেক রান করেছি কিন্তু বিপক্ষ টিমও খুব ভালো খেলছিল। পাঁচটা উইকেট আমরা ফেলে দিয়েছিলাম কিন্তু আর আউট করতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি সাহিন দৌড়ে কাছে এসে বলল, 'এটাই ওদের লাস্ট ভালো ব্যাটসম্যান জুটি। এর পরে আর কেউ ভালো ব্যাটই করতে পারে না।' নূর আর মলয়কে স্লগ ওভারের জন্য রাখা ছিল। ওদের তক্ষুনি পরপর দু ওভার বল করতে ডাকি। দু'জনে দু'টো উইকেট নিয়ে খেলা শেষ করে দিল।

আশু আর সুরজিৎ-এর মজার টিপ্পনি আমাদের সব সময় উজ্জীবিত রাখত। খেলার মাঝে ছোট ছোট মজা আমি খুব পছন্দ করতাম, সুরজিৎ সেটা খুব ভালো করে জানত। সুরজিৎ বরাবরের আমার রুম পার্টনার ছিল। যে সহযোগিতা আমি ওর কাছে পেয়েছি তা কখনো ভোলার নয়।

খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার আর একজনকে পেয়েছিলাম হোস্টেলে—এক জুনিয়র ভাই কৌশিক (১৯৯৭)। সে ছিল স্টার ফুটবলার। সকাল সকাল মাঠে তার ফুটবলের কেরামতি দেখতে আমি প্রায়ই হাজির থাকতাম। এক সুমধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে। আমরা পরস্পরের খেলাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। পরে কৌশিক জুনিয়র মোহনবাগানের হয়ে খেলেছিল।

সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ি যাওয়ার ট্রেন লাইনের পাশে একটা গ্রাম (সম্ভবত খেরুয়া) সেই বছরেই বিশাল একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল। গ্রামের নিজস্ব একটা টিম ছিল। সাঁইথিয়ার যত ভালো ভালো প্লেয়ার সবাইকে গ্রামের টিমের হয়ে খেলিয়েছিল। গোটা টুর্নামেন্টে আমাদের হোস্টেল দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল। ফাইনালে আমাদের বিপক্ষে ছিল গ্রামের সেই টিম। পুরো টুর্নামেন্টে প্রত্যেকটা খেলা হত বারো ওভারের। কিন্তু ফাইনাল হল কুড়ি ওভারের। আমরা ঠিক করেছিলাম পুরো কুড়ি ওভারই ব্যাট করতে হবে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমরা তাড়াতাড়ি প্রথম দুটো উইকেট হারাই। এরপরে আমার আর রাজদীপের পালা। খুব আস্তে আস্তে খেলছিলাম যাতে উইকেট না পড়ে, রান একদম উঠছিল না। গ্রামের কমিটির মাইক থেকে আওয়াজ এল —তোমরা একটু রান করো, না হলে খেলা যে জমছে না। আমি খেলতে খেলতেই কমিটির কাছে গিয়ে অনুরোধ করি—দয়া করে মাইকটি বন্ধ করুন, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। এতক্ষণ ওদের নামিদামি বোলাররা খুব ভালো বল করছিল, আমরা ততক্ষণে সেট হয়ে গেছি। এরপর শুরু হলো মার, ছক্কা আর ছক্কা। ১৮-১৯ ওভারে আমরা পরপর দু'জন আউট হয়েছিলাম, বোর্ডে তখন জেতার মত রান হয়ে গেছে। আমাদের চার সেরা বোলার মলয়, প্রদ্যুৎ, নূর, অমর ওদের ভালো ভালো ব্যাটসম্যানদের নাকানি চোবানি খাইয়ে দিয়েছিল। মৃদুলের দুর্দান্ত ফিল্ডিং, সাহিনের গোপন খবর, আমাদের সব বাধা পার করে দিয়েছিল।

এই টুর্নামেন্টে ১৯৯৭ ব্যাচের ফারুক, জামিল,

মুক্তার ও সইদুল প্রতিটি ম্যাচে উপস্থিত থাকত। আমাদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, এরা যদি কোনো ম্যাচে না যায় তাহলে আমরা সেটা জিততে পারব না। ফাইনাল ম্যাচে আমি 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হয়েছিলাম। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দ সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাত্রে সইদুল আমাকে একটা ছোট্ট গিফট দিয়েছিল। গিফটটা কি সেটা বলছি না, কিন্তু সেটার সঙ্গে যে সম্মান মিশে ছিল তা এতদিন পরেও ভাবতে ভাল লাগে।

যে ভালোবাসা আমার হোস্টেলের ভাই দাদা বন্ধুদের কাছে পেয়েছি, তার কোন তুলনা হয় না। মেডেল, কাপ, পুরস্কার—সেই বস্তুগুলো হয়ত আজ ভেঙে ক্ষয়ে গেছে, জং পড়েছে। তবে, সেই সময়ের প্রত্যেকটা আউট, মিস, চার, ছক্কা এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে অল্প ব্যর্থতা আর বেশিরভাগ সাফল্যের দুরন্ত কয়েকটা বছর আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব, একতা, জেদ আর সম্মান এনে দিয়েছিল; তাতে কোনো জং পড়েনি; আজও।

দুই ইনিংসের কাহিনী

প্রথম ইনিংস : হোস্টেল যখন প্রতিপক্ষ

বুবুল সরকার
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫

আমার লেখার নামকরণে কি ধাক্কা লাগল? নামকরণের আসল রহস্য জানতে আজ থেকে পিছিয়ে চলে যাব ১৯৯৫ সালে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে যোগদান করি তৎকালীন দাদাদের সহযোগিতায়। খেলাধুলো খুব ভালবাসতাম। আমাদের সময়ে ক্রিকেট খেলার প্রচলন ছিল বেশি। একটু আধটু খেলতে পারতাম, তাই হয়ত দাদারাও স্নেহ করত। প্রথম বছর থেকেই ক্রিকেট টিমে চান্স পেলাম। দ্বিতীয় বছর দলের ক্যাপ্টেন হল আমাদের বন্ধু তরুন সাহা। দারুন ক্যাপ্টেন। দলের প্রত্যেকের কাছ থেকে সেরাটা বের করে নিতে পারত। দলে আমার জায়গা হল উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে। পরের বছর পাঁচটা টুর্নামেন্টে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম কোনো ম্যাচ না হেরে।

তার কিছুদিন পর থেকে অনেক নতুন প্লেয়ারের আগমন বা যে কোনো কারণেই হোক, হোস্টেল টিমে আমার গুরুত্ব কমতে শুরু করল। অথচ, খারাপ খেলছিলাম না। রাগ হত খুব। কিন্তু দলের সঙ্গে যে সত্যানন্দদেবের নাম জড়িত। তার জন্য সব সময় নিজের সেরাটা দিতে এবং দলের যে কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে থাকতে প্রস্তুত। মেনে নিলাম সবকিছু।

পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরলাম। শুধু খেলা আর খেলা। এলাকায় ক্রিকেট প্লেয়ার হিসেবে পরিচিতি বাড়ল। কিন্তু মনের মধ্যে হোস্টেলের টিমের কিছু সিদ্ধান্তের কাঁটা রয়েই গেল। হোস্টেলের মাঠে নিজেকে একবার প্রমাণ করার ইচ্ছেটা থেকেই গেল।

সুযোগ এল ২০০১ সালে। হোস্টেলের মাঠে একটা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পাণ্ডবেশ্বর থেকে দল নিয়ে গেলাম। আমার এলাকার নামি দামি ক্রিকেটার নিয়ে দলটা গড়েছিলাম। প্রথম ম্যাচে কোনোরকমে জিতলাম। দ্বিতীয় ম্যাচে সাঁইথিয়া নেতাজী সংঘকে ভালোভাবে পরাজিত করলাম। তৃতীয় ম্যাচ সেমিফাইনাল। প্রতিপক্ষ সত্যানন্দ ছাত্রাবাস।

আমি তো ভালোভাবেই জানি এই টিমের স্পিরিট আর ডেডিকেশন। যদিও অনেক নতুন প্লেয়ার এখন। তবুও হোস্টেলের যে কোনো প্লেয়ার টিমের জন্য দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, আমার এও জানা। তাই নিজের টিমকে বারবার সতর্ক করেছিলাম।

ম্যাচের দিন টিম নিয়ে মাঠে গিয়ে দেখলাম আমাদের সময়ের একটা মুখ—তরুন। বুঝলাম ওরা জেতার জন্য মরিয়া। পুরনো ক্যাপ্টেনকে দেখে আমার পুরনো ব্যাথাটা চেগে উঠল। খেলা শুরু হল।

টিম পাণ্ডবেশ্বর প্রথমে ফিল্ডিং করছিল। প্রথমে ব্যাট করে হোস্টেলের টিম ১৬ ওভারে মাত্র ৫২ রান করেছিল। বিরতির সময় আমাদের প্লেয়ারদের মধ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করছিলাম। আমার টিমের হরিন্দর, বিশাল, কৌশল, রাজা-এদের কাছে ওই রান কিছুই না। তাও আমি বারবার সতর্ক করেছিলাম আমার টিমের প্লেয়ারদের। হোস্টেল টিমের দুর্দান্ত বোলিং,

ফিল্ডিং, অসাধারণ ক্যাচ, সর্বোপরি অন্যান্য আবাসিকদের সারাক্ষণ থালা বাজানোর আওয়াজ—মাত্র দুই রানে আমরা হেরে গেলাম। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও জিততে পারলাম না। খেলার শেষে প্রত্যেকে আমার খেলার তারিফ করেছিল—আমার পক্ষের এবং বিপক্ষের সবাই।

সেদিন দেখেছিলাম সত্যানন্দ ছাত্রাবাস দলের প্রত্যেক সদস্যের অসাধারণ ডেডিকেশন। একদিন এই দলে এই মানসিকতা নিয়ে খেলেছিলাম বলে অবাক হইনি। ম্যাচ শেষে আমার দলের প্লেয়ারদের যখন মাথা নিচু, আমার মনের ভেতরে যেন একটু আনন্দ হল। হোস্টেলের জয়ে কোথাও যেন আমার মাথাটাও উঁচু হয়ে গেল। এটাই আমার জীবনের সেরা ম্যাচ। হেরেও মনে মনে অন্যরকম একটা প্রাপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম।

তবে, এখানেই শেষ নয়। এবার এই একই ম্যাচ মানবের দৃষ্টিতে আমরা দেখব। মানব ছিল সত্যানন্দ ছাত্রাবাস টিমের মূল হোতা। আমি মানবের হাতে কলম তুলে দিলাম।

দ্বিতীয় ইনিংস : টিম সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

মানবেন্দ্র রায়
(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৭)

ধন্যবাদ বুবুলদা, আমার হাতে কলম তুলে দেওয়ার জন্য।

আমি ১৯৯৭ সালে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে এসেছি। আর হস্টেলে এসে প্রথম বছরেই সত্যানন্দ ছাত্রাবাস ক্রিকেট টিমে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে জায়গা পাকা করে নিয়েছিলাম। বুবুলদা যে ম্যাচের কথা বলল সেটার কথা বলার আগে আমি একজনের কথা বলতে চাই—তরুণ সাহা, আমাদের প্রিয় তরুণদা। তরুণদার মতো নিখুঁত ক্যাপ্টেন্সি আর তার সঙ্গে প্রতিটা ম্যাচে নিজের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স আমাদের মুগ্ধ করত। আরও একটা গুণ তরুণদার ছিল। কোনো প্লেয়ারকে একবার দেখলেই তার প্লাস পয়েন্ট এবং মাইনাস পয়েন্ট বুঝে নিয়ে সেইমতো ফিল্ড সাজাত। তারপর আমাদের বোলারদের থেকে সুপরিকল্পিত বোলিং করিয়ে সেই প্লেয়ারকে আউট করত। এক কথায়, খেলার মাঠে তরুণদা যেমনটা চাইত তেমনটাই হত। তরুণদার কথা শুরু করলে আর শেষ হবে না।

এবার বলি সেই ঐতিহাসিক ম্যাচের কথা। বুবুলদার পাণ্ডবেশ্বর বনাম আমাদের হোস্টেল। সালটা ছিল ২০০১। তখন তরুণদা, বুবুলদা, রাজদীপদা সবাই এক্স-বোর্ডার হয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো ম্যাচ থাকলে আমরা তখন শুধু তরুণদাকে নিয়ে আসতাম খেলার জন্য। সেইমত এই ম্যাচটার আগের দিন রাত্রে আমি, মলয়, হিমাদ্রি গৌড় এক্সপ্রেস ধরে চলে গেলাম নলহাটী। তরুণদাকে নিয়ে চলে এলাম সকালে। তারপরে দেখলাম বুবুলদা টিম নিয়ে আসছে। বুবুলদার টিমে তখন বর্ধমান জেলার সেরা চার পাঁচ জন প্লেয়ার। আমি ওদের চিনতাম, ওদের খেলাও দেখেছি। খুব ভাল প্লেয়ার ওরা। সত্যি বলতে ধারে ভারে বুবুলদার টিমের কাছে আমাদের এই টিম কিছুই না। আলাদা আলাদা প্লেয়ার ধরে বিচার করলে ওরা দশে আট পেলে আমরা হয়ত চার পাব। আমি ভয় পেলাম, নির্ঘাত হারছি সেমিফাইনাল ম্যাচ। একটা ব্যাপার শুধু লক্ষ্য করছিলাম ওদের প্লেয়াররা আমাদের দেখে কেমন একটা হেলাফেলা, গাছাড়া ভাব দেখাচ্ছিল। বুবুলদা ব্যাপারটা বুঝে ওদের বকাঝকা করছিল—'এটা সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, এখানকার চাল খেয়েছি আমি, এই হোস্টেলের অনেক গুণ, তোরা হালকা ভাবে নিস না, নিলেই হারবি।'

ম্যাচ শুরু হল। আমরা প্রথমে ব্যাট করে ৫২ রান করলাম। আগে বলি, কোনো ম্যাচে আগে ব্যাট করে আমরা যদি ৪৫ রান করে দিতাম, তাহলে অধিকাংশ সময়

জিততাম। তার কৃতিত্ব শুধু আমাদের বোলিং বা ফিল্ডিং নয়, সবথেকে বড় কৃতিত্ব মাঠের ধারে বসে থাকা আমাদের হোস্টেলের বাকি আবাসিকরা। তাদের সারাক্ষণ গলা ফাটিয়ে চিৎকার, থালা বাটি বাজানো, মুড়ির টিন পেটানোতেই অপোনেন্ট টিম অর্ধেক হেরে যেত। বাকি অর্ধেকটা কাজ আমরা মাঠে করতাম।

এবার বুবুলদাদের ব্যাটিং-এর পালা। ওপেন নামল হরিন্দর আর বিশাল গিরি। দুর্ধর্ষ আর ক্ল্যাসিক প্লেয়ার সব। হরিন্দর ফেস করছে। বোলিং-এ আমাদের আবদুল কাদের। আমি স্কোয়ার-লেগ বাউণ্ডারিতে দাঁড়িয়ে। কিপিং করছে অমিত দাস। প্রথম বলটাই কাদের খুব জোরে করল, আর অমিতের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল থার্ডম্যান অঞ্চল দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে চলে গেল। ভাবলাম, যাহ্ প্রথম বলেই চার হয়ে গেল। কিন্তু পরেই দেখি অমিত আর কাদের লাফালাফি করছে আর হরিন্দর মাঠের বাইরে যাচ্ছে। কাদেরের বল হরিন্দরের বেল উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বেলদুটো পাওয়া গেল বাউন্ডারির কাছে।

তারপর নিয়মিত উইকেট পড়তে থাকল বুবুলদাদের। তরুণদা যাকে যা নির্দেশ দিচ্ছে, আমরা সবাই একশ শতাংশ করতে পারছিলাম সেই সময়। তারপর একসময় বুবুলদা এল ব্যাট করতে। বুবুলদা একজন জাত ব্যাটসম্যান এবং দুর্ধর্ষ উইকেটকিপার ছিল। বুবুলদার কথাও যতই বলব, ততই কম বলা হবে, বলা শেষ হবে না। বুবুলদা খুব বুদ্ধির সঙ্গে ব্যাট করেই যাচ্ছিল, আর অন্যদিকে ওদের উইকেট পড়ছিল। তরুণদা এবার নিজে এল বল করতে, আর আমার ভাই মান্নাকে নিয়ে এল। আমাকে স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারিতে সতর্ক থাকতে বলল। তরুণদা নিজে আর মান্নাকে দিয়ে স্লোয়ার এবং খুব লোভনীয় বল করতে শুরু করল বুবুলদাকে, যাতে বুবুলদা ভুল করে এবং আউট হয়। মানে, বুবুলদাকে ছয় মারার জন্য লোভ দেখানো হল। অনেকক্ষণ খুব ভালো খেলেও সেই ফাঁদেই পা দিল বুবুলদা। মান্নার বলে ছয় মারতে গেল, আর ঠিক আমার হাতেই এসে জমা পড়ল বুবুলদার হুক শট। আমরা এই ঐতিহাসিক ম্যাচ ২ রানে জিতে ফাইনালে পৌঁছলাম।

এই ম্যাচ জেতার আড়ালে প্রথমেই আছে ঠাকুর সত্যানন্দদেবের আশীর্বাদ। তারপর এর কৃতিত্বের অধিকারী সেদিন মাঠের বাইরে উপস্থিত আমাদের হোস্টেলের সমস্ত বোর্ডার। তারপরের কৃতিত্ব তরুণদা এবং আমাদের টিমের সমস্ত ক্রিকেটারের পাওনা।

ধন্যবাদ তরুণদা, ধন্যবাদ বুবুলদা, ধন্যবাদ দুই টিমের সকল সদস্য, ধন্যবাদ হোস্টেলের সমস্ত আবাসিক, প্রণাম জানাই ঠাকুর সত্যানন্দদেবকে। এবং, ধন্যবাদ জানাই সবশেষে নিজেকে। আমি গর্বিত এই ছাত্রাবাসে, এই ম্যাচে এবং এই লেখার মধ্যে থাকতে পেরে।

Hostel anecdotes

Sandeep Golder
Entry year : 2002

My first day experience at Sainthia Satyananda Chattrabas was horrible. Before that I had not spent a single night outside home. Now I was in the midst of some unknown guys–a few of them looked scary (seriors), a few of them looked scared (1st year inmates) and a few of them looked queer (so called 'taals'). In that situation, the only thought that came to my mind was 'ye kahaan aa gaye hum'. The only solace I had was in the form of Partha, my cousin, the only face known to me in the sea of unknowns. Anyhow after spending half a day in the hostel, both of us decided to flee back home. Likewise, we went out of the hostel without informing anybody. Sitting on the banks of Mayurakshi for hours, we could not decide where to go. We were definitely not in a position to go back home because our parents would consider it our failure to adjust ourselves in hostel condition. After the nightfall, we went back to hostel but this time with new vigour and tolerance (maybe made possible by Mother Mayurakshi's bliss). This time we entered the hostel campus with a new resolution-never to turn back whatever situation may be. After that day the 'unknowns' gradually became 'knowns' and all odds evenified. We slowly started enjoying our hostel days. Amidst all these, we met our 3rd Idiot, Chandan and we there became room-mates. Time began to flow fast and one year passed. We became senior from juniors. One day Chandan informed us that the boy next to our room has bought a one kilogram pack of Horlicks and a giant pack of biscuits.

Now, that boy never shared his food items with anyone. So, we decided to steal the packet of Horlicks and biscuits from that boy's room. To make this happen we called for a dummy meeting in the Super room. The meeting started after ensuring everyone's presence especially that boy. As we were discussing upon false agenda, two among us went to that boy's room and stole the coveted food items. Then they signalled us to end the meeting and we did likewise. On that night, we feasted upon the food items stolen from that boy's room. But later we felt sorry for him and at morning we went to him to apologize. He smiled at us and said that the way adopted by us was unfair but it was the only way to get share in his food items–as he never likes to share his food items. After that incident, we swore news to repeat such kind of deed again. This is one of the countless memories of my hostel days.

সেই রাত এবং স্মৃতি

বিষ্ণুচরণ পাল

প্রবেশবর্ষ : ২০০৪

অভিশপ্ত রাতেরা যখন ঘুম কে শত্রু ভেবে নেয়, অন্তহীন অপেক্ষা ভোরকে ফেলে দেয় আলোকবর্ষ পথের অপর প্রান্তে। মনের ভেতরমহলে ধাক্কা মারতে থাকে হাজারো বেখেয়ালি ভাবনা। নিঃসঙ্গতার প্রহর খুঁজতে থাকে সেইসব সুবর্ণ মুহূর্তদের যেগুলি মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠতে থাকে ক্রমাগত আর ক্রমাগত ঝাপসা হতে থাকে দৃষ্টিপট। ফিরে পাওয়া যাবে না জেনেও শুধু স্মৃতিসুখ লাভের আশা থাকে ভিতরে। এমনই এক রাতের স্মৃতি এখন ভেসে আসছে আমার মননে।

তখন ২০০৪ সাল, তারিখ বা মাস কোনটাই মনে নেই আমার। আমরা আমাদের প্রিয় ছাত্রাবাসের নতুন বোর্ডারস-ফার্স্ট ইয়ার এবং রেস্ট্রিকশন পিরিয়ড সবে পার হয়ে এসেছি। আমাদের অবস্থা তখন অনেকটা বাঁধন ছাড়া গরুর মতো। আমরা মোট তেত্রিশ জন ফার্স্ট ইয়ার ছিলাম। সকলের সাথে আলাপ হয়েছিল ঠিকই তবে ঘনিষ্ঠতা তখনো আসেনি। সেদিন রাত্তিরে খাওয়া শেষ করেছি সবে তারপরেই লোডশেডিং। স্বপ্নের 'ছাদলোকে' আমাদের আড্ডা বসতো এইরকম অন্ধকারের রাজত্বে। ভীষণ রকম গরম ছিল তখন। গল্প করছি একটু আধটু। অনেকেই ছিল সেখানে। এর আগে আমরা সিনিয়র দাদাদের কাছে শুনেছিলাম রাত্রে স্টেশনে চা খেতে যাওয়ার রোমাঞ্চকর বিবরণ। ইচ্ছে জাগলো আমাদেরও।

অনেকের মধ্যে একমত হলাম আমরা তিনজন, সুবীর (সিনহা), কৌশিক (ভট্টাচার্য) ও আমি। আর কেউ তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না। তাই অনভিজ্ঞ বুকে ছেলেমানুষী সাহস সঞ্চয় করে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে। আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা হোস্টেলে তেমন কেউই জানত না। হোস্টেল থেকে স্টেশন প্রায় এক কিমি হাঁটা পথ। ল্যাম্পপোস্টের আলোকিত পথে কুকুরের ডাক-কে তুচ্ছ করে গুটি গুটি পায়ে রওনা দিলাম। পথের মাঝে পড়ে থানা। মজার বিষয় হল, আমরা আগেই শিখেছিলাম, যদি থানার সামনে পুলিশ জিজ্ঞাসা করে এত রাতে কোথায় চললাম, আমাদের উত্তর হবে একটাই—গৌড় এক্সপ্রেসে মালদা থেকে সিনিয়র দাদা নামবে। তাকেই রিসিভ করতে যাচ্ছি। আর ফেরার পথে হলে আমাদেরই কেউ একজন হয়ে যাব মালদার সেই সিনিয়র দাদা যাকে বাকী দু'জন নিতে এসেছে। যদিও আমাদের কাছে কোন লাগেজ ব্যাগ ছিল না। যাই হোক সেই প্রশ্নের মুখে আমাদেরকে পড়তে হয়নি।

পৌঁছে গেলাম স্টেশনে। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিখ্যাত চা খেয়ে এসে বসে পড়লাম ওভার ব্রিজের কাছাকাছি একটা বেঞ্চে। প্ল্যাটফর্মে ভিড় খুব একটা ছিল না। ফুরফুরে হাওয়ায় বেশ আমেজ। এরকম রাত্রি জীবনে আগে আসেনি কখনো। আমরা তিনজনেই ছিলাম ইংরেজি অনার্সের ছাত্র এবং পড়তাম রথীন স্যারের কাছে। আমাদের আড্ডার সূচনা সেই দিয়েই। একটু একটু করে রাত্রি বাড়তে থাকলো আর বাড়তে থাকলো নিজেদের জীবনের অতীতচারণ—ভালোলাগা, মন্দলাগা। ওদিকে সময় স্রোত আবহমান নিজস্ব গণ্ডিপথে, অথচ আমাদের কারোরই 'হোস্টেলে ফিরতে হবে' এই বিষয়টায় গুরুত্ব নেই। খিদে পেয়েছিল। চায়ের সাথে লম্বু খুব ভালো একটা কম্বিনেশন ছিল আমাদের। সে এক অদ্ভুত মুহূর্তের খেলা। প্রত্যেকের ঝুলি থেকে বের হতে থাকলো অফুরন্ত রহস্যভেদ; বিষয়—প্রেম, ক্রিকেট, গান, কবিতা, টিউশনস্যার, কলেজ, হোস্টেল, প্রফেসর আর তার সাথে নিজস্ব অতীতপাঁচালী। ওদিকে হোস্টেলে কি হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম।

ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছুঁই ছুঁই। ফর্সা হয়ে আসছে চারপাশ। তিনজনেই অনুভব করলাম এবার ফেরা যাক। প্ল্যাটফর্মের শেষ চা, বিস্কুটের সাথে পান করে হোস্টেলে ফেরার পথে রওনা দিলাম। না ঘুমোনোর ছাপ চোখে মুখে ছিলই। আমাদের জন্য যে কি অপেক্ষা করে আছে আমরা তা টের পেলাম কিছুক্ষণ পর। স্পষ্ট মনে পড়ে, পালির মোড় পর্যন্ত সবে এসেছি। উল্টো দিক থেকে কাঞ্চনদা (ভট্টাচার্য), বিদ্যুৎ, পার্থ, সুরেশ, হাবিব, হাফিজুল, অনন্তদা সহ আরও জনা কয়েক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমাদেরকে দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়ে গেল তারা। কাঞ্চনদা আশেপাশে লাঠি খুঁজতে শুরু করল রাগের চোটে। অনন্তদা অমায়িক ছেলে, রাগ সংযত করে উপদেশ দিল যে এভাবে সারা রাত্রি বিশেষ কাউকে না জানিয়ে হোস্টেলের বাইরে থাকা আমাদের উচিত হয়নি। বাকীদের কথায় সুস্পষ্ট হল যে, তারা যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছিল আমাদের খোঁজে। একটু লজ্জিত বোধ করলাম ঠিকই কিন্তু, ভিতর থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম সত্যানন্দ ছাত্রাবাস শুধুমাত্র ছাত্রদের এক বাসস্থান নয়, এ এক এমন আশ্রয় যেখানে রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ছোট, বড় নির্বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অগণিত ছাত্রদের মধ্যে। আর সেই সম্পর্কের টান থেকে যায় আমরণ, এমনকি মৃত্যুর পরেও।

সেই রাত্রের আমাদের তিনজনের মধ্যে অন্যতম সুবীর (সিনহা) বর্তমানে আর আমাদের মধ্যে নেই। ২০১২ সালে সে স্বেচ্ছায় ইহলোক ছেড়ে চলে যায়। তার মৃত্যুতে আমরা তখনও শোকাহত ছিলাম, আজও তার অভাব ততটাই বোধ করি যখন মিলিত হই সকলে। আর এই অভাববোধ, জানি, থেকেই যাবে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রিয় ছাত্রাবাসে সম্মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকব।

যেখানে নিঃশ্বাসের শব্দ শোন যায়...

কৌশিক ভট্টাচার্য
প্রবেশবর্ষ : ২০০৪

''জিন্দেগি কে সফর মে গুজর যাতে হ্যায় যো মকাম / ও ফির নেহি আতে, ও ফির নেহি আতে...''—ফেয়ারওয়েলের দিন। সুবীর গাইছে। এই গানটা চারজনকে ডেডিকেট করছি—অমর, বাহালুলদা আর দুই কৌশককে—সুবীর বলল। আজ সব স্মৃতি। ফুল লিখতে হ্যায়—কিন্তু বিকাশের আগেই ঝরে গেল ওর পাপড়ি, পুড়ে গেল ডালপালা। সিউড়ি হাসপাতালের মর্গ থেকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছি ওর নিথর দেহ, তুলে দিচ্ছি শয়নযানে, ও চলে যাচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। ছেড়ে যাচ্ছে আমাদের উথালপাথাল সময়, ডাইনিং রুমের বাচালতা, সোনুর কভি আলবিদা না কহে না, শাহরুখের কাল হো না হো, রিয়েলিটি শো নিয়ে মত্ত টিভি রুম, প্রথম বিয়ারের অভিজ্ঞতা, কাউন্টার করা সিগারেট, জগজিতের গজল, ইন্টার-হস্টেল টুর্ণামেন্ট আর অনন্ত যুদ্ধের ময়দান। অথচ আমার কবিতাতে লিখেছিলাম—রণভূমে আমি সুবীর, আলোর দিশারি। কিন্তু আজ কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো! কী লিখব হস্টেল নিয়ে আমি? আমাদের অমৃত আস্বাদনের দিনে তীব্র গরল হয়ে আছে সুবীর, গরল হয়ে আছে অপূর্ব, নিয়াজুল। এদের কথা মনে পড়লে নিজের অপদার্থতার কথা মনে পড়ে যায়। কী শিখলাম হস্টেল থেকে? কী শিখলাম সত্যানন্দের ছাদের নিচে আশ্রয় নিয়ে যদি বন্ধুর জন্য এক টুকরো ছাদের ব্যবস্থাই না করতে পারি?

রঞ্জিতদা যেদিন লেখার জন্য বলল ভাবলাম কী লিখব অমি? স্বর্গ নিয়ে কি লেখা যায়? স্বর্গ, শুধু অনুভব করা যায়। যে হস্টেল আমাদের যৌবনের উপবন, যে হস্টেল আমাদের সেকেন্ড হোম, যে হস্টেল আমাদের প্রেমিকাদের সতীন তাকে নিয়ে লেখাটা স্পর্ধা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাকে উদ্দেশ্য করে শুধু বলা যায়—''গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।''

হস্টেল আমার কাছে অল টাইম দীপাবলী। যে আতসবাজির ফুলঝুরি হস্টেল আমাদের দিয়েছে তাতে পিছনে ফিরে দেখলে হস্টেলকে আমার উৎসব মনে হয় যে উৎসবকে আমি তলানি অব্দি পান করতে চাই—''I will drink life to the lees.'' প্রথম প্রেমের পতনের পর আমি জীবনের পথে উত্থিত হয়েছি এই ছাদের তলায়, এখানকার কাঁঠালগাছের ছায়ায় জুড়িয়ে নিয়েছি বুকের পাঁজর, হাল না ছেড়ে কণ্ঠ ছেড়েছি টপের ওপরে বসে I shall go to the top, to the top, to the top. এখানেই তো আমাদের প্রথম বাগযুদ্ধ—শাহরুখ না আমির? সৌরভ না শচীন? লাভ ইয়া ধোকা? এইখানেই তো আমাদের প্রথম বিদ্রোহ আর চুমু, এইখানেই তো আমাদের রুখে দাঁড়ানো আর সমর্পণ, পতন এবং উত্থান, নাবালক ও একই সঙ্গে সাবালক হওয়া—এই ছাত্রাবাস জানে আমার প্রথম সবকিছু।

আমার কোনো দাদা ছিল না নিজের, কিন্তু সেই আক্ষেপ কখন তুড়ি মেরে যে উড়িয়ে দিল কাঞ্চনদা, আনন্দদা, বাহালুলদা! আমার কোনো মেট ছিল না। কিন্তু সেই ঝুটা অভিমানে কখন যে ঝাঁটা মারল সুবীর, আদিত্য, পার্থ! আমি খুব একা ছিলাম, খুব একা, কিন্তু সেই একাকিত্বে কখন যে ভাগ বসাল সত্যানন্দ ছাত্রাবাস কিছুই বুঝতে পারিনি, শুধু বুঝেছি—এ স্বাদের ভাগ হবে না।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় কবেই লিখে গেছে—ভেবে দেখেছ কি তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে, তারো দূরে/ তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। আমরা সরে গিয়েছি হস্টেল থেকে, সরে গিয়েছি সম্পর্ক থেকে

(দূরত্ব বাড়ে, যোগাযোগ নিভে যায়), আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছি পৃথিবী থেকেও কিন্তু যে টুকরো পৃথিবীর মধ্যে আমরা মহাপৃথিবীর খোঁজ পেয়েছিলাম, একটা ছোট্ট জীবনের মধ্যে যে অনন্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছিলাম, একটা ভেঙে পড়া বিশ্বাসের মাঝেও যেভাবে দিন বদলের গান গেয়েছিলাম, এই ধর্ষিত স্বপ্নের দেশে, এই মৃত্যু উপত্যকার দেশেও যেভাবে আমরা স্বপ্ন ফেরি করে চলেছিলাম তার জন্য এই সত্যানন্দ ছাত্রাবাস, তার জল, মাটি, হাওয়া কৃতজ্ঞতা দাবি করে। বিশুদার অক্লান্ত প্রশ্রয়, সন্দীপদার ইন্টেলেকচুয়াল খুনসুটি, রঞ্জিতদার স্নেহ, সুনীতদার অকারণ শাসন, বুবুল, জীবা, বৃন্দা, সুশীল, ব্রজর আদরের অত্যাচার, ট্যাম্পাদা, কালিদা আর গৌতমদার অলংকারহীন দাবিদাওয়া, দিলীপদার বাক্যালংকার, ডালিমদার তেল ও নিতাইদার ঝাল মিশ্রিত বাক্যবাণ, বাপিদার বুগনিমিশ্রিত চপ-ঘুগনি ইত্যাদি প্রভৃতি অজস্র অজস্র ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো স্মৃতি আর চাকচিক্য, কোলাহল আর নিঃশব্দতা, প্রেম আর প্রত্যাখ্যান, অভিমান আর ভেঙে পড়া সব কোলাজ, আজ আনন্দলোকের মতো পবিত্র, বেদনা আর বিষাদের মতো স্থায়ী। প্রেম আর প্রাচুর্যের এই যে দিগন্ত বিস্তারকারী নিঃশ্বাস সত্যানন্দের নামাঙ্কিত ছাত্রাবাস আমাদের ভিতর তিরতিরে নদীর মতো বইয়ে দিয়েছে তার স্রোত আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর মতোই উৎসারিত হয়ে চলবে না কি? যতক্ষণ শ্বাস আমাদের চলবে ততক্ষণ— 'Be like a flower' নামক স্বপ্নের পাশে আমরা হয়তো মধুর লোভে ভনভন করে যাব। এই আমাদের নিয়তি, এই আমাদের পরিচয়। এর থেকে নিস্তার ইহজীবন আমাকে কখনো দেবে না, তোমাদেরও দেবে কি?

Superconductivity for non-experts

Haranath Ghosh
Entry year : 1984

This one page "non-technical, non-accurate (comparisons)" write up for hostel magazine is meant for non-expert younger beginners of all disciplines. Super-(= very much or excellent) conductors are those materials which conduct excellently well as compared to normal metals (however good it is). Current flow in normal metals occurs due to motion or flow of (single) charge particles like electron. So something more (superior) happens in superconductors (what is it!?). When electrons travel in metals to produce current (say), in general, it gets collided with various imperfections, ions or among themselves. So each material has its own degree of resistance to flow, "resistivity". So when we switch on fan or charge our mobile for a while our regulator/mobile gets warm. A generator will get heated if it runs for longer period. Imagine we have "superconducting wire" which do not have any resistance, so there will be no dissipation, no power cuts; once you produce current it continue to flow for a very long period (persistent current)—what a revolution will that be!!!

Superconductors have zero resistivity below certain temperature called critical temperature (Tc). It expels magnetic field (called Meissner effect) penetrating inside till certain magnitude called critical field (Hc). Similarly it can carry current up to certain limit called critical current (Jc). So quality of a superconductor, in terms of practical applicability can be improved by improving the ability of the superconductor to hold higher Tc, Hc and Jc. Suppose the critical temperature is very high of a superconductor (let us say room temperature) then it can be used for day to day use. Unfortunately, achievable critical temperature is still way below at ambient conditions but shows hopeful trend. If it can withstand very high critical current then it can be used to produce very strong magnets. MRI/NMR devices, magnetic-energy storage systems, use superconducting magnets which are also necessary in accelerators. The Large Hadron Collider (LHC) is the world's largest and most powerful particle accelerator. It consists of a 27-kilometre ring of superconducting magnet. Some particles like electrons have magnetic moment (spin i.e., they are intrinsically very tiny magnets) which interacts with magnetic field and strong magnetic field thus can deflect accelerated electrons. The property of expulsion of magnetic field by superconductors can be used to "uplift or float" very heavy magnetic objects (trains say) called magnetic levitation this resulted in frictionless high speed trains in Japan, China etc.

In superconductors, unlike in metals, a (collective) pair of electrons together flow,

called Cooper pair that is responsible for zero resistivity. How is it possible for "a pair of electrons to be together" and flow? After all, the same charges repel!? There is no conclusive understanding on the subject for high-Tc phenomena. Suppose two-electrons can flow together (see below how) if they are tied by some (unknown) force/glue. Imagine you alone have to cross a steep hill; it will be very difficult, as there is every chance of getting slipped and falling (e.g., resistance in metal). But if you are tied with another person, even if you slip, you don't fall as the other person tied with you can help getting you up and vice versa; together cross the hill easily (resistance less/superfluous conduction in superconductor). Suppose you alone go to a club where in a mystical musical background, a large number of couples dancing/rounding each other and continuously changing partners while moving but never single (collective Cooper pair!). An outsider single person cannot find a partner and does not enter the room.

Thus like semiconductor, insulator, superconductors also have a gap in the single electron energy spectrum but its nature (physics) is very different. For example, in semiconductor/insulator if one may think it as a signature of poor conduction, in superconductor it is the energy to bind two electrons or the energy required for a single electron to overcome the binding energy of the Cooper pair. Finally, how is it possible for two electrons to form a Cooper pair? A solid may be thought of as a collection of positive charges arranged in particular symmetrical fashion (lattice) in which electrons travel. An electron when travels through the lattice can attract/polarize heavy positive lattice towards it. Lattice being very heavy moves very slowly towards the electron during which it travels very fast and moves away. A second electron feels an extra positive back ground of the lattice (created by the first electron) and thus gets indirectly attracted to the first electron. (This is the essence of Bardeen-Cooper-Schiffer or BCS theory for superconductors). For high-Tc superconductors the profile (wave function) of the Cooper-pair may have zero(s)/nodes and may carry non-zero orbital (as well as spin) angular momentum to avoid Coulomb repulsion between electrons. Such superconductors are called unconventional superconductor (complete understanding on such pairing mechanism is still an active research area; many body screened Coulomb interaction between electrons at higher distances may be attractive in higher angular momentum that manifests in spin channels, "spin fluctuation theory") can have higher critical values.

Artificial Intelligence SAIV and my visit to home

[A journey from Home to office through Artificial Intelligence SAIV]

Kalyan Mitra
Entry Year 1986

গত জুলাই মাসে (২০২৩) সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। শিকড়ের টান প্রতিমুহূর্ত হৃদয়ে অনুরণন হলেও দেশের বাড়িতে যাওয়া ঘন ঘন হয়ে ওঠে না, আর প্রতিবার পৌঁছানোর পর মনে হয় অনেক কিছু হারিয়ে ফেলছি, আরও তাড়াতাড়ি বা ঘন ঘন আসতে হবে। এবারে এসে সব কিছুই খুব উপভোগ করলাম, সঙ্গে সেই পুরানো দিনের ভ্যাপসা গরম যা আনন্দের মাত্রাকে কমানোর চেষ্টা করেছিল। সময়টা জুলাই মাস, মৌসুমী বায়ুর জন্য সর্বাধিক বৃষ্টির একটি মাস (অন্যটি অগাস্ট মাস) হলেও, বৃষ্টির দেখা ছিল না, আর সেকারণেই চাষও বন্ধ। এমতাবস্থায় একদিন বাইরের বৈঠকখানার বারান্দায় বসে আছি। অনেকের সাথে দেখা হচ্ছে, টুকটাক কথাবার্তা হচ্ছে, মনটাও প্রফুল্ল হয়ে আছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সকলে একটা চিন্তার কথা বলছে যেটা হল এবারে বোধহয় ধান ভালো হবে না, কারণ সকলেরই প্রায় এক রকম অনুমান যে এবছর বৃষ্টি ভালো হবে না। এমন সময় এলেন বদিদা, ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি। বদিদা-কে 'দাদা' হিসেবেই ডাকি, যদিও বাড়ির গুরুজনদের কাছে শুনেছি বদিদা নাকি ৬০ বছর এর উপর আমাদের বাড়িতে চাষের কাজ করেন। উনি আমাদের বাড়ির একজন সদস্যের মতো। যদিও বদিদা আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, তবুও আব্দারের খাতিরে তুমি বলেই ডাকি। একটু আলাপচারিতার পর বদিদা বলল, 'তোমরা তোমাদের বাবা কাকাদের মত হওনি, কোনো কাজের নও।' প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি বদিদা চার বা পাঁচটা প্রমোশন পেয়ে বর্তমানে প্রজেক্ট ম্যানেজার, এবং এটা তার নিজের কর্মদক্ষতায়। চিরাচরিত লেখাপড়া করার জন্য স্কুলে না গিয়ে বা বিদ্যালয়-এর শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে বা সেইরূপ লেখাপড়া না জেনে যে জীবনে কিছু করা যায়, আমার চোখে বদিদা তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। আমি স্কুল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে বর্তমানে তথাকথিত ভালো কাজ করলেও, আমি শুধু বিশ্বাসই করি না, মনে প্রাণে বুঝি যে বদিদা আমার থেকে অনেক বেশি স্মার্ট। যাইহোক, বদিদাকে বললাম 'কেন, কি হল? আমি আবার কি করলাম?' বদিদার কথায় (শুধু কথাই বা বলি কেন), বদিদা গম্ভীর ভাবে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাল যে, আমি কিছু করলাম না, আর সেটাই নাকি সমস্যা। একটু মজা করার জন্য, কিছু কি করতে পারি সেটা জানার জন্য, আমি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, ''What can I do for you– sir?'' অবাক হয়ে দেখলাম যে বদিদা আমার কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল, আর প্রত্যুত্তরে বলল, ''আজকাল কম্পিউটার দিয়ে অনেক কাজ হয়, ওটা কাজে লাগিয়ে গ্রামের চাষিদের কোনওরকম সাহায্য কি করা যায় না?'' ওই সময় পাড়ার ছেলেরা দুর্গাপুজোর চাঁদা নিতে আসায় প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা আর হল না।

গ্রাম ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, বন্ধনের শিকড়কে ওখানেই রেখে গাছটা নিয়ে দূর দেশে পাড়ি দিলাম। যদিও কাজের চাপে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তবুও মাথার মধ্যে বদিদার কথাগুলো রিন্ রিন্ করে বাজতে থাকত, ভুলে যাইনি বা ভুলতে পারিনি। এমতাবস্থায় পলাশ (jr.) হঠাৎ করে একদিন বলল একটা লেখা দিতে হবে হোস্টেল এর ম্যাগাজিনের জন্য। সকাল ৯ টা থেকে ৫ টা অফিসের কাজে ব্যস্ত, অধিকাংশ কাজই মনে হয় যেন কপি পেস্ট করে হয়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে যে দীর্ঘদিনের এই রকম কর্ম জগতে থেকে creativity বলে কোনো কিছু আর অবশিষ্ট আছে। পলাশকে কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু মনে মনে স্নেহ করি, তাই আর কথাটা এড়াতে পারলাম না, ভাবলাম চেষ্টা করেই দেখি না। তাই আজ আমার এই কলম

ধরে লিখতে বসা। ভুল ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বেশি, আর সেই ত্রুটি যেন প্রাক্তনীরা না ধরেন।

পপুলেশন বাড়ছে, নূতন নূতন বাড়ি হচ্ছে, ফ্যাক্টরি হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে, সবই দরকার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমি কমছে, ফসলের চাহিদা বাড়ছে কিন্তু জমি কমলে চাহিদা মিটবে কি করে? Mathematician বা Statistician রা গবেষণা করে অনুমান করছেন যে জনসংখ্যা ৯.৭ বিলিয়ন (৯৭০ কোটি) হয়ে যাবে ২০৫০ এর মধ্যে। এত লোকের খাবার ফলাতে হবে, আর এই ফসল উৎপাদনের পুরো চাপটা নিতে হবে এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি কে, সোজা কথায় চাষিকে।

So, we have to produce more food with limited resources and at the same time, we

have to reduce environmental impact, and there comes Artificial Intelligence (AI). Here I will discuss a few points about how we can leverage AI to enhance agricultural productivity and overall efficiency that can reduce the global food crisis.

1. Precision Agriculture: AI Powered tools such as Drones, Sensors, Satellite images can collect huge amount of data about soil, crop, health, weather pattern, water quality, water availability and much more, then Machine Learning (ML) algorithms can analyse this data and can tell our farmers about what kind of seed to use, when to plan, when to apply water and fertilisers or pesticides. Remember, "One size fits all" theory will not work. For example, the seed that works well in Hooghly may not produce the same result in Pandabeswar, Bardhhaman. There are a lots of (10000+) agricultural startups who are currently working on these. For example, seedX a startup that can create hybrid seed specific to your area and based on your need.

2. Crop Monitoring and Management: AI Powered tools like Drones and Sensors can continuously monitor crops by detecting water, nutrient deficiency, signs of pests and diseases and alert the farmers. Then the farmers can spot the area and spray water or pesticide to that specific area instead of large-scale use. This can also be done using the same Drones used for identification of the crop health. This saves water, pesticides, increases productivity, and also saves the environment.

3. Autonomous Farming: AI driven autonomous tractors and the other machinery can help the farming community in planting, plowing, and harvesting without much human intervention. This does not only save labour cost, it gives more efficiency and accuracy.

4. Supply Chain-Price Prediction: AI along with Big-data can analyse market data and can help farmers to make strategies on what is the least crop to grow, when to grow, and when to sell so that farmers can get the best return of their investment. Combining AI with IoT (Internet of Things) Sensors, Drones, and big-data analytics can play a big role in the agriculture industry to improve productivity and sustainability in years to come.

আমার দৃঢ় ধারণা যে চাষিদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। I strongly believe that in the next decade after semiconductor industry and space industry, agriculture is the only industry which will see a double digit growth.

The challenge is in implementation, there are some infrastructural issues but we will gradually overcome those. Yes, we will feed India, will feed the whole world, we can do it.

Moon and Chandrayan-3, India's Latest Lunar Mission

Md. Mossaroff Hossain
Entry Year : 1992

Moon is the only natural satellite of Earth. It is also the celestial body closest to Earth. Its presence in the night sky has sparked curiosity and fascinated the humanity for centuries. It has been one of the oldest companions of human race through its journey of evolution. Its influence on the human civilization is documented in the mythologies of almost all known civilizations. Artists as well as poets and scientists have thought about the Moon's influence on living creatures on Earth since long. A considerable number of studies have examined the influence of Moon on behaviour and physiological changes in the living beings on Earth including the humans. Though, there is no proof in case of humans, there is clear evidences of the effect of lunar cycle in a number of marine animals. For example, corals, a type of marine backboneless animal group, contain light-sensitive protein cryptochrome and tend to match the breeding time in the evening or night around the last quarter of the lunar cycle. Moon had been the timekeeper since the olden days of humanity, when there was neither the clock nor the calendar, and thus had immense influence on the almanac and agricultural activities.

In our solar system, natural satellites of most of the planets are much lighter (a few

thousand times) than their respective central planets. But, our Moon is only about eighty times lighter than Earth. So, it is substantially massive to have significant gravitational influences on Earth, and hence Earth and Moon contribute mutually to their relative motion and collective dynamics. For example, it is believed that Moon has played pivotal role to gravitationally stabilize the orbit of the Earth by reducing its wobbling motion, which was substantial during its initial years of formation. Also, the tidal effects due to Moon's gravitation has reduced the spin of the Earth from very fast (~ 2 to 5 hour) to the present ~24-hour period. Thus, Moon's gravitational influence has facilitated the climate on Earth suitable for the existence of lives. It is believed too that Lunar tides brought marine life from seas, where life presumably originated, to land, where they evolved into land species. So, whether we would have existed without

Moon's influence is the subject matter of intense debate.

The Moon, today, presents enormous scientific potential for the humankind. Scientists have identified the Moon as an important record-keeper of the solar system. Since, it is an airless celestial body, meteorites and asteroids of various sizes directly hit lunar surface without being burn. These celestial bodies bring with them varieties of minerals and metals to the lunar surface.

These materials are preserved well in the lunar regolith as there is no chemical weathering (reaction) in the Moon because of lack of air. Also, since Moon is a celestial body with no global magnetic field, solar winds reach the lunar surface directly and continuously dumps various elements including Helium ($_2He^3$) that is said to have the potential for efficient power generation.

Hence, Moon can provide clues on the evolution of our solar system as it, being an effective record-keeper, can be a natural laboratory to study the interaction of solar wind, meteorites and solar radiation with the planetary surfaces. Study of craters that exist in various sizes in the Moon also offers opportunity to understand the impact processes in the planetary scale. Being the closest planetary body, reaching Moon and sample return missions carried out by a few space agencies worldwide so far have been encouraging for the economical exploration of the entire solar system and beyond. In fact, the frozen ice in the lunar poles, when split into hydrogen and oxygen, can be used as an effective fuel option in this regard. Finally, space tourism and human colonization look imminent. If gets implemented, resources in our planet earth may be well preserved by sharing with that of the Moon.

There have been many missions to explore our Moon. The first lunar mission was a flyby mission named Luna-1 that was sent by the then USSR in 1959. That was the time when two powerful space forces Russia and America were in tough competition. We had seen many lunar expeditions by them in the 1960s. In 1966, Russia had two major missions: First orbiter around the Moon as well as the first lander mission. Lunar Orbiter as well as Surveyor lander were the two major missions that were sent by USA in 1966. Subsequently, USA had went ahead and achieved a remarkable feat by landing the humans for the first time in the history of the lunar exploration on 20 July, 1969. Afterwards, till 1976, there were a series of Apollo and Luna missions by them including sample returns and crewed roving on the lunar surface.

After about one-and-half decade, in 1990, lunar explorations were again resumed and Japan became the first Asian country to send the flyby/orbiter mission Hiten to Moon. Afterwards, China had its first orbiter mission Chang'e-1 in 2007. In 2008, India had its first lunar mission Chandrayaan-1 that included an orbiter and an impactor 'Moon Impact Probe (MIP)', which was the first human-made object from Asia to land on Moon for scientific investigations. Among several path-breaking results, a major discovery of Chandrayaan-1 is the detection of water near the lunar pole using the instruments Moon Mineralogy Mapper (M3) of NASA and Chandra's Altitudinal Composition Explorer (CHACE) of ISRO. Afterwards, China had demonstrated landing, roving and sample returns between 2010 and 2020. We had Chandrayaan-2 mission involving orbiter and lander in 2019. Even though,

we could not land on the Moon, orbiter has been studying the Moon even now and has provided a few discovery class results. In 2022, Artemis 1 mission marked the NASA's return to lunar exploration after conclusion of its Apollo program five decades earlier. Forthcoming Artemis series missions seek to reestablish the human presence in Moon and demonstrate technologies and business approaches needed for the future scientific studies including exploration of Mars.

We have seen three lunar missions in 2023. One of them is lander mission Hakuto-R from Ispace, a Japanese venture that failed to land in April 2023. A few months later, on 19 August 2023, Russia's Luna-25 lander crash landed on Moon. Shortly thereafter, our Chandrayaan-3 successfully soft landed in Moon on August 23, 2023. Chandrayaan-3 mission has demonstrated India's coveted landing and roving capability on lunar surface for the first time. On the other hand, scientific endeavour in this mission is to understand Moon's rudimentary composition, thermophysical properties, near-surface plasma environment, and seismic signatures among others. It may be noted, in this context, that although the scientific quest to understand Moon has taken remarkable strides, our nearest celestial neighbour still remains an enigma. With this mission, India has joined the ranks of Russia, United States, and China as the fourth nation to master the art of soft lunar landing, and the first nation to land in southernmost latitude of Moon so far. The landing site that is located about 600 kilometres from the south pole of Moon has been given the name 'Shiva Shakti point (69.3° S, 32.3° E)' and the day of landing has been dedicated to the nation as the 'National Space Day'. Chandrayaan-3 is the lander (Vikram, named after ISRO founding father Dr. Vikram Sarabhai) cum rover (named Pragyan) mission. ISRO's heaviest satellite launch capable rocket Launch Vehicle Mark-III (LVM3) had launched the lander (with rover in its lap) integrated with the Propulsion Module from Satish Dhawan Space Centre at Srihorikota range, Andhra Pradesh. Propulsion Module had carried the lander from launch vehicle injection orbit to the final lunar 100 km circular polar orbit, where the lander was separated from the propulsion module. The propulsion module has a payload 'Spectro- polarimetry of Habitable Planet Earth (SHAPE)' to carry out spectral and polarimetric measurements of Earth from lunar orbit. SHAPE measurements may aid in future discoveries of smaller planets and exoplanets with the presence of Earth-like lives, if any.

On July 14, 2023, Chandrayaan-3 started its journey. The lander cum propulsion module was launched in an elliptical orbit (169 km x 36,490 km). Subsequently, it underwent four orbit raising manoeuvres before the execution of Trans Lunar Injection on August 1, 2023, when it achieved the escape velocity, liberated from the Earth's gravitational influence and was put into a hyperbolic lunar transfer trajectory aiming towards Moon. Chandrayaan-3 was then captured by lunar gravity on August 5 and put into the lunar orbit of 164 km x 18,074 km. Subsequently, four orbit lowering manoeuvres had led to the 153 km x 163 km orbit. On August 17, lander had achieved an important breakthrough, when it started on independent journey after detaching itself from the propulsion module. Afterwards, a carefully planned sequence of de-boost operations had placed the lander into

a refined orbit of 25 km x 134 km. The lander then settled into this orbit and waited for the lunar dawn at the designated landing site. On August 23, at 17:47 hours, the most critical moment of powered descent began. The autonomous landing sequencer initiated the descent of lander from the lowest point of its orbit, which is about 25 km above the lunar surface and about 700 km away from the landing spot. Speed of lander at start of decent was about 1.6 km/s. At this point, engines were fired for about 11 minutes to implement the rough braking that reduced its speed as well as altitude from the lunar surface. At the end of rough braking, lander's height from the lunar surface became about 7 km and it was about 30 km away from the landing spot. At this point, the lander maintained this altitude for a while, stabilized itself through the fine braking and rotated from horizontal to the vertical position while continuing its descent. During this phase, Vikram lander, being vertical, had hovered above the ground at a height of about 800 m right on the landing spot. After hovering for a moment, altitude was decreased to about 150 m by firing the engines suitably. Lander hovered there for about 30 seconds, and since everything was fine, the onboard computer committed to the final descent. In about the next 70 seconds, Vikram Lander had covered those 150 m and finally soft landed on the lunar surface with speed of about 1m/s, making that moment unforgettable to each and every Indian.

All the science payloads of this mission have worked very well. The cameras have taken amazing photographs, both from the orbit as well as after landing. Specifically, the close-up and stereoscopic (for 3D view) images are breathtaking and expected to be released for the public in an appropriate time. Most of the science payloads were involved in first-of-its-kind lunar investigations. In particular, the payload from my group RAMBHA-LP (Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive ionosphere and Atmosphere - Langmuir Probe) has made first-ever measurements of the near-surface Lunar plasma environment near south pole. Preliminary results show that the plasma near the lunar surface is relatively sparse with about 10 – 180 electrons/cc during the observation period of 1 lunar day. It is expected that this payload will make fundamental contribution to the lunar plasma physics. Rover Pragyan has roved 100 meter of path over the Moon surface. On the last day (Earth) of the mission, ISRO demonstrated 'hopping' of the lander, where the lander was lifted to a height of about 40 cm through about 1 second of engine firing and allowed to free fall on the lunar surface. This hopping can be seen as a precursor for our return journey from Moon in future lunar sample return or crewed missions. Finally, the lander and rover were put to sleep mode before the lunar evening embraced the landing site. During the next lunar day, we had tried everything to wake them up, but they did not. They could not have survived the prevailing extreme weather conditions. With this, they have become India's lunar ambassadors for ever. Albeit, India has achieved more than what was expected from this mission.

*লেখক আমাদের গর্বের চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের সময় ইসরোয় কর্মরত এবং বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

র‍্যাগিং—ফিরে দেখা

পলাশ ব্যানার্জী
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৪

সময়টা ১৯৮৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। গ্রাম থেকে আসা পনেরো অনুত্তীর্ণ একটি কিশোর কলেজ বাসস্টপে নেমে বেডিং-ব্যাগ হাতে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে হোস্টেলের দিকে হাঁটা দিল। দিগন্তবিস্তৃত কলেজের মাঠ পেরিয়ে হোস্টেল। ক্যান্টিলিভারের নীচ দিয়ে পেরোতেই সামনের করিডোরে চৌকি পাতা—সেখানে দুজন সিনিয়র বসে। নিদান দিলেন, ব্যাগ-বেডিং রেখে এইখানে আয়।

ছেলেটির দাদার তখন একবছর হোস্টেলে থাকা হয়ে গেছে। তার রুমেই আপাততঃ থাকার ব্যবস্থা। সেখানে লাগেজ রেখে করিডরে সে সিনিয়র দাদাদের কাছে এল।

প্রথমেই প্রশ্ন এল, লালচটি-নীলচটি ফর্মুলা বল। জানি না, চুপ করে থাকে ছেলেটি। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় গোঁফের রেখা না ওঠা ছেলেটির দুগালে দুটো বিরাশি শিক্কার থাপ্পড়। তারপর উত্তর সে দাদাই দিলেন,(লালচটি + নীলচটি)/২ এর স্কোয়ার মাইনাস (লালচটি-নীলচটি)/ ২ এর স্কোয়ার। আবার দুটি থাপ্পড়, কানমলা ও রুমে ফিরে যাওয়ার হুকুম।

হয়তো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, ১৯৮৪-র সেই কৈশোরে আসা আবাসিকটি আমি।

সদ্য আমাদের রাজ্যের একটি সেরার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া র‍্যাগিং, কিশোর স্বপ্নদীপের প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা এসব নিয়ে যখন সারা দেশ তোলপাড়, খবরের কাগজে, টেলিভিশনে, সোশ্যাল মিডিয়াতে বড় বড় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, মনোবিদ, ছাত্রনেতারা যখন টেবিল গরম করছেন এবং এ নিয়ে যা কিছু আলোচনার প্রায় সবই করে ফেলেছেন তখন এমন একটা বাসি ও এড়িয়ে চলা উচিত বিষয়ে লিখতে এলাম কেন—সে কৈফিয়ৎও দেওয়া দরকার। আমার মনে হয়েছে খুব প্রাথমিক কিছু বিষয় বিশেষজ্ঞরা এড়িয়ে যাচ্ছেন বা ভাবেননি।

একথা অন্তর থেকে স্বীকার করি, র‍্যাগিং পর্বের পরে সে দাদাদের সাথে যথেষ্ট আত্মিক সম্পর্ক হয়েছিল, যা আজও সমানভাবেই আছে। কিন্তু এটাও তো মানতেই হবে, কোথাও কারো কারো মধ্যে একটা সাইকো-স্যাডিস্ট মানুষকে দেখেছিলাম, যা আজও মনে থেকে গেছে।

আজ কর্মজীবনের শেষ পর্বে এসে যখন সবটাকে দেখি, তখন অনুভব করি—র‍্যাগিং বিষয়টা মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ছিল। যেদিন থেকে মানুষ অন্য প্রাণীকুলের উপর নিয়ন্ত্রণ নিল, সেদিন থেকেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের উপরেও নিয়ন্ত্রণ তার হক বলে ধরে নিল। প্রাচীন মিশর সভ্যতায় ফারাও ও পুরোহিতরা সাধারণ দেশবাসী ও দাসদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাগু করল ধর্মের ও রাজার নামে। এবং সভ্যতার বিকাশে সাধারণ মানুষের কিছুই লাভ হল না। সবটাই রাজার নামে।

পরবর্তীতে আজটেক সভ্যতা, মায়ান সভ্যতা ও অন্যান্য মেসো-আমেরিকান সভ্যতাতে ও আমরা একই চিত্র দেখি। সেখানে ধর্মের নামে, উৎসবের নামে স্থানীয় উপজাতিদের বন্দি করা ও দেবতার নামে গণ-বলিদান দুর্বলের উপর সবলের পূর্ণ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণেরই প্রকাশ।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতা, আরব সভ্যতা, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব সর্বত্র একই চিত্র—দুর্বল মানুষকে চূড়ান্ত নিপীড়ন ও হত্যার মধ্যে দিয়ে সভ্যতার বিকাশ। মধ্যযুগের ইউরোপে নারকীয় সব পদ্ধতিতে সন্দেহভাজন মানুষ ও দাসদের হত্যা, রোমান সভ্যতার গ্ল্যাডিয়েটর—উদাহরণের শেষ নেই।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমাদের ছাত্রাবাসে র‍্যাগিং এর ইতিহাস কতদিনের? আমার ধারণা, আমাদের কলেজ

ও ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার স্বর্গীয় স্বামী কৃষ্ণানন্দের সরে যেতে হওয়ার পর থেকেই। ডাঃ কে.ডি. রায় যতদিন ছিলেন ততদিন এ সাহস কারোর হওয়ার কথা নয়। তাহলে একটা বিষয় পরিষ্কার, প্রতিষ্ঠানের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলে র‍্যাগিং সম্ভব নয়।

সেসময় র‍্যাগিং-এর দুটি ভাগ ছিল। একটা দিক হল জোকস (প্রধানতঃ অশ্লীল), কিছু বুদ্ধিদীপ্ত মজার প্রশ্ন। যেগুলো না পারলে বুলিং করা হত ঠিকই, কিন্তু সে বুলিং আমার অন্তরাত্মাকে আহত করত না। সিনিয়ররা, এমনকি আমাদের অভিভাবকরাও এটাকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দিতেন। মানতেই হবে, এক চিলতে ঘরে একশো হতে এই দিকটা অনুঘটকের কাজ করেছে।

আবার উল্টো দিকটাও আছে। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে দু-একটা মুখ যে বীভৎসতা নিয়ে হাজির হয়, তাতে তো এটাও বলতে হয়—বিষয়টার মধ্যে ধর্ষকামী যে অনুভবটা সেই কৈশোরের শুরুতে হয়েছিল, তা আজও অবচেতনে থেকে গেছে।

এত কিছুর পরেও মানতে হবে, আমরা যারা র‍্যাগিং দিয়ে ছাত্রাবাস জীবনে অভিষিক্ত হলাম, তারা পরের বছর নতুন ছেলেরা আসবে বলে চরম উৎসাহিত হয়ে পড়লাম। অনেক সিনিয়র র‍্যাগিং করতেন না, কিন্তু র‍্যাগিং রুমে আসাটা বাধ্যতা ছিল। আমরা কেউ কখনো বন্ধ করতে পারিনি। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এটা অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অঙ্গ।

একটা বিষয় খুব নাড়া দেয়, আমাদের যে বন্ধুরা সিনিয়র হওয়ার পর র‍্যাগিং মাস্টার হয়েছিল তারা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, কারোর বাবা স্বনামধন্য শিক্ষক। এদের কারোর বড় হওয়ার মধ্যে কোনো স্যাডিসম্-এর অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। তাহলে কি এই তত্ত্বটা এসে যাচ্ছে না—মানব সভ্যতার উত্থানের মূল সুরটি, দুর্বলের উপর সবলের দখলদারী, কোথাও অবচেতনে আমাদের মনস্তত্ত্বে স্থায়ী জায়গা করে রেখেছে। র‍্যাগিং সমাজের সর্বত্র আছে ও থাকবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন আধিকারিক তার নীচের স্তরের কর্মীদের প্রতিনিয়ত র‍্যাগিং করেন। কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়া এক ব্যাংকের অফিসারদের সাথে তাঁদের কর্তা অফিসারের কথোপকথনের যে ভিডিও সবার সামনে এসেছে তা ভয়াবহ। এখানে শুধুই র‍্যাগিং নয়, তার সাথে মানুষটির আত্মমর্যাদাকেও চূড়ান্ত ক্ষতি করা হচ্ছে। ধরুন, আমি আমার কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন দ্বারা অপদস্থ ও তিরস্কৃত হলাম। আমি এই অপমান বয়ে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় বাস কন্ডাক্টর অথবা কোনো হকারের সাথে বা টোটোচালকের সাথে তুচ্ছ বিষয়ে দশ কথা শুনিয়ে দিলাম। না হলে বাড়ি ফিরে কোনো বিষয় নিয়ে তুমুল অশান্তি করলাম। আসলে আমার অন্তরাত্মার যে অপমান হল তার ক্ষরণ না হওয়া অবধি শান্তি নেই।

প্রধান কারণ হল, সমাজে সর্বত্র সহনশীলতার অভাব, পারস্পরিক সম্মানবোধের অভাব। এ শিক্ষা অবশ্যই পরিবার দেয়। তার চেয়েও বেশী দেয় সমাজ, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন। কলেজ ছাড়িয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, সেখানে যেটা পেলাম তা র‍্যাগিং-এর বিপরীত শব্দ বলাই ঠিক। এখানে একটা বিষয় অনেকেই তুলবেন, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পূর্ণভাবে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেখানে ছাত্রাবাসে থাকতে হলে সে স্রোতে যেতেই হত। এ প্রসঙ্গও আসবে যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী অনেকেই হোস্টেলে থাকতে পারেননি ইত্যাদি। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বলব, দক্ষিণপন্থী কোনো সংগঠন তৈরি করার মতো ব্যক্তিত্ববান মানুষের খোঁজ তখন সেখানে পাইনি।

তাহলে পথ কি? কিভাবে স্বপ্নদীপদের হত্যা বন্ধ করা সম্ভব? শুধু তো হত্যাই নয়, একটি ছাত্রের ব্যক্তিত্বের উপর চরম আঘাত, সেও তো কোথাও একটি স্বপ্নের হত্যা। শাস্তির ভয় বা শাস্তি দিয়েও কি বন্ধ করা সম্ভব? তাহলে ১৯৮৯-এ আমাদের সাতজন বোর্ডার এর কলেজ থেকে T.C. দেওয়ার পরে চিরতরে বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। পরবর্তীতে তা চালু ছিল বলেই জেনেছি।

বড় বড় প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং এর যে চিত্রটি আজ সামনে এসেছে তাতে এই র‍্যাগিংকারী ছাত্রদের চরিত্রের ভয়ঙ্কর দিকটি বেরিয়ে এসেছে। যে অশ্লীল বিবরণ দিতে বাধ্য করা হয়, তা কোনো সুস্থতার পরিচয় হতে পারে না। আমাদের সময়েও বেশ কিছু খ্যাতনামা বিদ্যায়তনেও এই ধরনের র‍্যাগিং এর কথা শোনা যেত। কিন্তু এখন যে মাত্রায় এবং যে সম্পর্কগুলোর মধ্যে অশ্লীলতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,

সেটা তখনো আসেনি। বিষয়টা অনেকটা হার্ডকোর উগ্রপন্থী তৈরির জন্য যে কিশোরদের তুলে আনা হয়, তাদের ট্রেনিং এর মতো। এই র‍্যাগিং-এর মধ্যে চরম আত্মহনন এর আবহাওয়া। একজন হত্যা হল, বাকি সবাই বেঁচে থাকল শরীরে, কিন্তু অন্তরাত্মার হনন তো হয়েই গেছে।

তাহলে সমাধানের পথ কি? ছাত্র তকমা কেড়ে নেওয়া, সার্টিফিকেট বাতিল করা জাতীয় শাস্তি ছাড়া সরাসরি কোনো সমাধান আছে বলে মনে হয় না। এর বাইরে ভূমিকা নিতে পারে ভাল ছাত্র সংগঠন, যা আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি ও যার আশ্রয়ে থেকেছি।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। সমাজের সর্বস্তরে প্রতি মুহূর্তের যে র‍্যাগিং, তার সমাধান হবে কি করে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, যোগাযোগ, প্রত্যেকের নিজের সাধ্যমতো কোনো মানবিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা, এসবের দ্বারাই সম্ভব। আসুন, র‍্যাগিংমুক্ত এক পৃথিবী তৈরির শপথ নিই।

'আনন্দদীপ' পত্রিকার সাফল্য কামনায়

আহারেতে পরিচয়

রেলিশ ক্যাটারার

আপনাদের তৃপ্তি, আমাদের অহংকার

সাঁইথিয়া, এফ. সি. আই গোডাউন রোড, বীরভূম
মোবাইল : 9046617221, 9474919021

কান্দি মহকুমার বিরলতম বিষ্ণুমূর্তি : একটি অনুসন্ধান

কুণালকান্তি সিংহরায়

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৪

'মানুষ নিজের প্রতিবিম্বের আদলেই সৃষ্টি করেছে দেবতাদের মূর্তি।' —গ্রিক দার্শনিক জেনোফেন (৪৩১ খ্রিস্টপূর্ব-৩৫৫ খ্রিস্টপূর্ব)

কথামুখ :

মুর্শিদাবাদের কান্দি থেকে বহরমপুর অভিমুখী সড়কপথে অবস্থিত পুরন্দরপুর গ্রাম। এই গ্রামের উত্তর দিকে কানা ময়ূরাক্ষী নদী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত। ভূগোলের ভাষায়, একে মজে যাওয়া ময়ূরাক্ষী বলা যায়। এই নদী পেরিয়ে কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করে পৌঁছানো যায় খড়গ্রাম ব্লকের একটি অনামী গ্রামে। নিরাপত্তার কারণে গ্রামের নাম অনুল্লেখ করলাম।

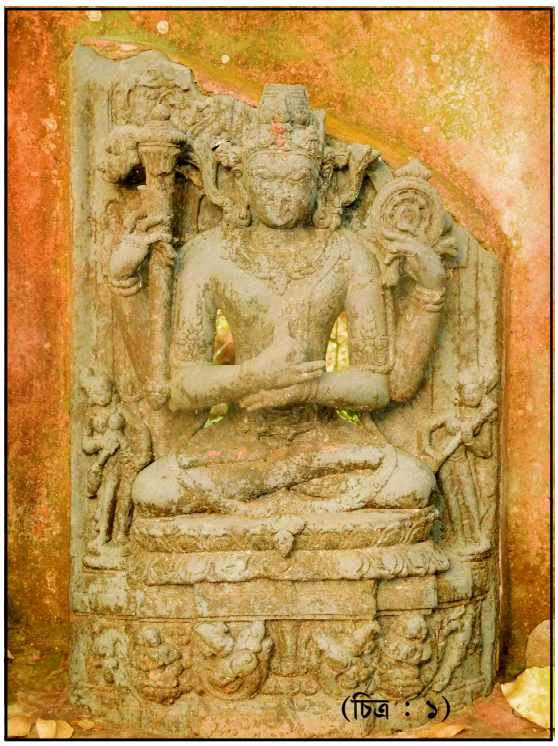

(চিত্র : ১)

এ যেন নামেই গ্রাম। চারদিকে ঘন-গভীর জঙ্গল। শুধুমাত্র একটিমাত্র পরিবার এখানে বসবাস করেন। তারপর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সামান্য পদব্রজে এগিয়ে গেলেই দেখা মিলবে হাজার বছরের প্রাচীন একটি বিষ্ণুমূর্তির। সিমেন্টের বেদীর সঙ্গে বিগ্রহটিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এখানকার বিষ্ণুমূর্তিটি একেবারে অভিনব (চিত্র : ১)। বিষ্ণু ধর্মচক্রমুদ্রায় এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর দুই সহধর্মিণী—শ্রীলক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতী বিষ্ণু দেবতার দু'পাশে দণ্ডায়মান রয়েছেন। এই ধরনের ভাস্কর্য ভারতীয় মূর্তিশিল্পে বিরল। কারণ বুদ্ধের সঙ্গে বিষ্ণুর সমীকরণ ঘটানোর এক অভিনব দৃষ্টান্তের অলোকসামান্য নিদর্শন হল এই বিষ্ণুমূর্তি।

ইতিহাসের দিকে ফিরে :

আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একবার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী ধর্মমতগুলির অন্যতম হল বৈষ্ণব ধর্ম, যার প্রধান দেবতা হলেন বিষ্ণু। খ্রিস্ট জন্মের বহু আগেই ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল।

'বিষ্ণু' নামটির আদি নিদর্শন মেলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সুপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে। এখানে তাঁর অবস্থান ভারি অদ্ভুত। ঋগ্বেদে তিনি প্রথম সারির দেবতারূপে গণ্য হতে পারেননি। আবার তাঁকে অপ্রধান দেবতারূপে ভাবাও যুক্তিসংগত নয়। কারণ এখানে তিনি ১০৫ বার উচ্চারিত হয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, তাহলে তিনি কী ধরনের দেবতা? বিখ্যাত পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি, অমূল্যচরণ বিদ্যভূষণ প্রমুখের

সুচিন্তিত অভিমত হল, ঋগ্বেদে বিষ্ণু হলেন সূর্যদেবতা। তবে পরবর্তীকালে রচিত রামায়ণ ও মহাভারত এবং পৌরাণিক সাহিত্যে বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং 'জগতের পালনকর্তা' হিসাবে সুবিদিত হন।

অন্যদিকে প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পঞ্চোপাসনা' গ্রন্থে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণব ধর্ম ও বিষ্ণুদেবতা সম্পর্কে যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তাকে মোটা দাগে সাজালে হবে এইরকম :

১) 'বৈষ্ণব' নামটির উৎপত্তি 'বিষ্ণু' থেকে।
২) সুপ্রাচীনকালে বৈষ্ণবধর্ম 'ভাগবত ধর্ম' হিসাবে সুপ্রচলিত ছিল। সম্প্রদায়-গতভাবে 'বৈষ্ণব' নামটির ব্যবহার শুরু হয় গুপ্ত যুগ (৩০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ) ও তার পরবর্তী সময়ে।
৩) বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর রূপকল্প তৈরি হয়েছিল তিনটি দেবতার সংমিশ্রণের ফলে। এই তিনজন দেবতা হলেন—ঋগ্বেদের আদিত্য বিষ্ণু, অবৈদিক নারায়ণ ও বাসুদেব কৃষ্ণ।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো গভীরে প্রবেশ করতে হলে ইতিহাসবিদ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং সুবীরা জয়সোয়ালের গবেষণা সন্দর্ভ অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার সূচনা হয় গুপ্তযুগে (৩০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ)। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য, প্রথম কুমারগুপ্ত প্রমুখ গুপ্ত সম্রাটগণের বিষ্ণুভক্তি ছিল অকল্পনীয়। তাঁরা কৌলিক প্রতীক হিসাবে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ব্যবহার করতেন। বঙ্গভূমিতে বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে পৌঁছেছিল একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন নৃপতিদের রাজত্বকালে। এই সময়ে বৃহত্তর বঙ্গে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার উত্তর-পূর্বাঞ্চল) অজস্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। সেন নৃপতিদের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর শক্তিপুর তাম্রশাসনের শীর্ষভাগে 'শিবম ওঁ নমো নারায়ণায়' শব্দগুচ্ছ উৎকীর্ণ রয়েছে।

বিষ্ণুমূর্তির কথা :

বিষ্ণুদেবতার পূর্ণাঙ্গ রূপকল্পনাকে পৌরাণিক সাহিত্যে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাকে মূর্তিশিল্পে বিগ্রহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার সুপ্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বিষ্ণুমূর্তির সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে গুপ্ত যুগে (৩০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত বিষ্ণুমূর্তিগুলিতে একাধারে শিল্প-সৌন্দর্য ও শাস্ত্রীয় বর্ণনার অপূর্ব মণিকাঞ্চন যোগ দেখা যায়। এখানে বিষ্ণু দেবতা হলেন চতুর্ভুজ। তিনি চার হাতে শঙ্খ (পাঞ্চজন্য), চক্র (সুদর্শন), গদা (কৌমুদকী) ও পদ্ম ধারণ করেন। তিনি সৌম্যকান্তি ও সুদর্শন। তাঁর দুই পার্শ্বে শ্রী বা শ্রীলক্ষ্মী এবং পুষ্টি বা সরস্বতী বিরাজমান থাকেন। আবার দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণুমূর্তিতে পুষ্টি বা সরস্বতীর পরিবর্তে ভূদেবীর বিগ্রহ থাকে।

বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'চতুর্বিংশতিব্যূহ তত্ত্ব'। এই তত্ত্বানুসারে বিষ্ণু হলেন চতুর্ভুজ ও একমুখী। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—বিষ্ণুর এই চারটি আয়ুধ বা ভূষণকে ভিন্ন ভিন্ন হাতে পরিবর্তন করে মোট ২৪টি পৃথক পৃথক বিষ্ণুদেবতার মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে বিষ্ণুর ২৪ প্রকার মূর্তির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

কান্দিতে বিষ্ণুমূর্তি :

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত কান্দি মহকুমা সম্পূর্ণভাবে রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এই মহকুমার পাঁচটি ব্লকের (খড়গ্রাম, বড়ঞা, ভরতপুর-১, ভরতপুর-২ ও কান্দি) অধিকাংশ গ্রাম থেকেই প্রায় ৫০টি মতো বিষ্ণুমূর্তির (বেশিরভাগই ভগ্নমূর্তি) নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, যার বৃহত্তম অংশই নির্মিত হয়েছিল পাল-সেন যুগে (৭৫০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ)। এই শ্রেণির বিষ্ণুমূর্তিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

১) একটি কালো পাথরের ফলকে (slab) প্রধান দেবতা বিষ্ণু এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গরুড় ইত্যাদি নিপুণভাবে খোদিত থাকবে।

২) কান্দির বিষ্ণুমূর্তির বৃহত্তম অংশ হল ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তি। ত্রিবিক্রম হল বিষ্ণুর ২৪ প্রকার বিগ্রহের অন্যতম রূপকল্প (চিত্র : ২)।

৩) ত্রিবিক্রম মূর্তি অনুসারে বিষ্ণু সমপদস্থানক ভঙ্গিতে

চিত্র : ২

একটি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান থাকবেন। তিনি অনন্ত যৌবনের অধিকারী। তাঁর চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত থাকবে। কখনো ওষ্ঠে ব্যঞ্জনাময় মৃদুহাস্য। দেবতার পিছনের ডান হাতে গদা, পিছনের ও সামনের বাম হাতে যথাক্রমে চক্র ও শঙ্খ এবং সামনের ডান হাতে তিনি পদ্ম ধারণ করবেন।

৪) বিষ্ণুর দুই সহধর্মিণীর মধ্যে ডানদিকে থাকবেন শ্রীলক্ষ্মী এবং বীণাপাণি সরস্বতী বামদিকে দণ্ডায়মান থাকবেন। উভয় দেবীই দ্বিভুজ এবং ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে অপূর্ব লীলা-লাস্যে বিরাজমান থাকবেন। একেবারে নীচের দিকে উৎকীর্ণ থাকবে বিষ্ণুবাহন গরুড়।

৫) কোনো কোনো বিগ্রহে শ্রীলক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতীর পাশে দু'জন আয়ুধ পুরুষ অথবা চক্রপুরুষকে দেখা যায়। আবার প্রধান দেবতার দুই পার্শ্বের পৃষ্ঠপটে উৎকীর্ণ থাকে কিন্নর-কিন্নরী ও গজশার্দুলের চিত্র।

৬) বিগ্রহের উপরের দুইদিকে মেঘের মধ্যে অবস্থান করবেন মালা হাতে দুই উড়ন্ত বিদ্যাধর, যাদের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ব্যাসাম 'স্বর্গের জাদুকর' আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যই তাঁদের সৃষ্টি।

৭) বিষ্ণুমূর্তির একেবারে শীর্ষে খোদিত থাকে গর্জনরত সিংহের মুখাকৃতি, যা মূর্তি শাস্ত্রে 'কীর্তিমুখ' বা The face of glory নামে পরিচিত। সাধারণত গর্জনরত সিংহকে শক্তির প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত।

খড়গ্রামের বিষ্ণুমূর্তি :

এবার খড়গ্রামের বিষ্ণুমূর্তিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। মূর্তিশিল্পে ভাস্কর্য প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা—স্থানক (দণ্ডায়মান), আসন (উপবিষ্ট) ও শায়িত (শয়ান)। বিষ্ণু এখানে দণ্ডায়মান নন; তিনি পদ্মপীঠের উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁর চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত। তাঁর মস্তকে কিরীটমুকুট, কর্ণে কুণ্ডল এবং ডান বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন বিদ্যমান। দেবতার পশ্চাতের বাম ও দক্ষিণ হস্তে যথাক্রমে সুদর্শন চক্র এবং কৌমুদকী গদা দৃশ্যমান।

এছাড়া দেবতার দক্ষিণে রয়েছেন চামর হাতে শ্রীলক্ষ্মী দেবী এবং বামে দেবী সরস্বতী বীণা হাতে দণ্ডায়মান। দুই দেবীই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় রয়েছেন। বিষ্ণু বিগ্রহের নাসিকাসহ মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ ক্ষতবিক্ষত এবং উপরের চালির অংশ সম্পূর্ণ ভগ্ন থাকায় বিদ্যাধরদ্বয় ও কীর্তিমুখ এখানে অদৃশ্য। একেবারে নীচের দুই দিকে অঞ্জলিবদ্ধ রয়েছেন গরুড়গণ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য হল, দেবতার সম্মুখের বাম ও দক্ষিণ হস্তে কোনো আয়ুধ নেই। একেবারে বুকের কাছে বাম হাতের উপর দেবতার দক্ষিণ হস্ত এক বিশেষ মুদ্রায় নিয়োজিত। একে মূর্তিশাস্ত্রে 'ধর্মচক্র মুদ্রা' বলা হয়। এই মুদ্রা ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। সারনাথে প্রাপ্ত আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের একটি অসামান্য বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে আলোচ্য বিষ্ণুমূর্তির চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় (চিত্র : ৩)।

সারনাথের ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করার পরে গৌতম বুদ্ধ সারনাথে তাঁর পাঁচ জন সঙ্গীর কাছে সর্বপ্রথম তাঁর

চিত্র : ৩

ধর্মোপদেশ ব্যক্ত করেছিলেন। এই ঘটনাকে বৌদ্ধ ধর্মে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলা হয়। পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্মে যুগ যুগ ধরে প্রচারিত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মহামানবের সেই অলোকসুন্দর রূপকল্পনাকে দর্শকের সম্মুখে অনির্বচনীয় মুন্সিয়ানায় চমৎকার উপস্থাপিত করেছিলেন সারনাথের সেই অনামী শিল্পী।

এখন প্রশ্ন হল, বিষ্ণুমূর্তির রূপকল্পনায় বৌদ্ধভাবনার সংমিশ্রণ কেন হয়েছিল? এটা জানতে হলে, আমাদের আরেকবার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তার পিছনে দুটি ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, যথা—রাজপৃষ্ঠপোষকতার প্রাবল্য এবং বিষ্ণুর অবতারবাদ। পণ্ডিত পি. ভি. কানের মতে, সপ্তম শতাব্দী থেকেই বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু হয় এবং বিষয়টির পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে দ্বাদশ শতকে সেন নৃপতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে। এই কাব্যগ্রন্থের দশাবতার স্তোত্রে কবি লিখেছেন :

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্
কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরে জয় জগদীশ হরে।"

(অনুবাদ : হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করে করুণাঘন হৃদয়ে জীবহত্যা দেখে বেদ বিহিত যজ্ঞের সতত নিন্দা করেছ, তোমার জয় হোক।)

আলোচ্য বিষ্ণু বিগ্রহটির প্রকৃতি ও গঠন কৌশলকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে, এই ধরনের শিল্পকর্ম আদি মধ্যযুগের বৃহত্তর বঙ্গভূমিতে পাল-সেন নৃপতিদের আমলে (৭৫০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) উদ্ভূত পূর্বাঞ্চলীয় শিল্পরীতির ঐশ্বর্যময় বহিঃপ্রকাশ। তবে মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার (বিশেষত C-১৪) কথা জানা যায়নি। এই ভাস্কর্যের মুখ্য উপাদান হল কালো পাথর বা ব্যাসাল্ট শিলা। এগুলির উৎপত্তিস্থল ছিল রাজমহল পাহাড়। শোনা যায়, বহু বছর আগে নিকটস্থ পুষ্করিণী থেকে মূর্তিটি উদ্ধার হয়েছিল।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য :

খড়গ্রামের এই অভিনব বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে সামান্য কিছুটা সাদৃশ্য মেলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত বিষ্ণুর একটি আসন মূর্তির মধ্যে (চিত্র : ৪)। একাদশ শতাব্দীর এই মূল্যবান প্রত্ন-ভাস্কর্যটি

চিত্র : ৪

অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা থেকে উদ্ধার হয়েছিল। এখানেও বিষ্ণু দেবতা পদ্মাসনে প্রস্ফুটিত পদ্মপীঠে উপবিষ্ট রয়েছেন। তিনি মস্তকে কিরীট মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে চন্দ্রহার ও বনমালা এবং বক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে রয়েছেন। চক্ষু তাঁর অর্ধ নিমীলিত। কালো কষ্ঠিপাথরের নীচের দুইদিকে অঞ্জলিমুদ্রায় বিষ্ণুর বাহন গরুড় পক্ষীর ক্ষুদ্রাকৃতি ভাস্কর্য বিদ্যমান।

সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যের দিকটিও উল্লেখ করা দরকার। এখানে বিষ্ণুর সম্মুখের দুই হস্ত ধর্মচক্রমুদ্রায় নয়; পদদ্বয়ের উপর ধ্যানমুদ্রায় বিরাজমান। বিখ্যাত মূর্তিতত্ত্ববিদ গোপীনাথ রাও এই ধরনের ভঙ্গিমাকে 'যোগমুদ্রা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ দেবতা গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন। ধ্যানরত অবস্থায় দেবতার বামহাতের তালুর উপর ডানহাত অপূর্ব ভঙ্গিতে প্রতিস্থাপিত করেছেন শিল্পী। মালা হাতে উড়ন্ত বিদ্যাধরদ্বয়ের উপস্থিতি প্রমাণিত। তবে তাঁর দুই সহধর্মিণী —শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই এখানে অদৃশ্য। দেবতার পিছনের দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হলেও বাম হস্তে সুদর্শনচক্র দীপ্যমান। গোপীনাথ রাও-এর মতে, এই ধরনের বিষ্ণুমূর্তি জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে আত্মার পরিত্রাণের জন্য কল্পনা করা হয়েছে এবং তাই যোগীদের উপাসনা করার জন্য এটি বিশেষভাবে উপযুক্ত।

শেষ কথা :

ইতিহাস ও সাহিত্যের ভিত্তিতে খড়গ্রামের এই অলোকসামান্য ভাস্কর্যের নির্মাণকালকে আমরা আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকের সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সময়টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল। তবে বুদ্ধ হারিয়ে যাননি। তিনি সঞ্জীবিত ছিলেন বিষ্ণুর নবম অবতারের মধ্যে । ফলস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম আরো জনপ্রিয় হয়েছিল।

অন্যদিকে ধ্যানী বুদ্ধ মুর্তির আদলে নির্মিত খড়গ্রামের এই অভিনব বিষ্ণুমূর্তিটির গঠন ও ভঙ্গিমায় শিল্পস্রষ্টা একাধারে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য জীবনের শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপস্থিতিতে) অপূর্ব মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছেন। তবে এখানে তিনি অজ্ঞাত। অর্থাৎ শিল্পকর্মে শিল্পীর কোনো নামোল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে খ্যাতি বা আত্মপ্রচারের অভিলাষী তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অতুলনীয় শিল্পকীর্তি থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিল্পীর উপলব্ধির গভীরতা ছিল অসীম ও অকল্পনীয়। তিনি শুধুমাত্র শিল্পী নন; শিল্পের অন্তরালে তিনি যেন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের এক পারঙ্গম বিদ্যোৎসাহী দার্শনিক। যিনি তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সাধনলব্ধ জ্ঞানের অনপনীয় স্পর্শ রেখে গিয়েছেন ভাস্কর্যের প্রতিটি নকশায় ও রূপকল্পে। এই ধরনের অপরূপ শিল্পকীর্তি শুধু মুর্শিদাবাদ জেলা নয়; সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেও দুর্লভ বলা চলে। বস্তুতপক্ষে ভাস্কর্যের গড়ন, শৈলী ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রেক্ষিতে এটি নিঃসন্দেহে একটি বিরলতম বিষ্ণুমূর্তির অনবদ্য দৃষ্টান্ত। তবে এ প্রসংগে ভিন্নমতকেও স্বাগত।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার :

১) পণ্ডিতবর শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, বিষ্ণু-মূর্তি-পরিচয়, সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ
২) নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
৩) জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৬০
৪) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য় পর্ব), ফার্মা কে. এল. এম., ২০১৫
৫) সুবীরা জয়সোয়াল, বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অনুবাদ : মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়, কে. পি. বাগচী, ১৯৯৩
৬) কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী, প. ব. বাংলা আকাদেমি, ২০১৬
৭) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, জেনারেল, ২০০০
৮) কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার ভাস্কর্য, সুবর্ণরেখা, ২০১৪
৯) অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (দুই খণ্ডে), ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৭৮
১০) মোঃ মোশারফ হোসেন, হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ, ঢাকা, ২০১৬
১১) দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, ২০০৭
১২) অপরেশ চট্টোপাধ্যায় ও কুণালকান্তি সিংহ রায় (সম্পাদিত), অঙ্গাঙ্গি : ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও কিংবদন্তি সংখ্যা, কান্দি, ২০১৭
১৩) অরিন্দম রায় (সম্পাদিত), মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান (৩য়

খণ্ড), মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বহরমপুর, ২০১৯
১৪) T. A. Gopinath Rao– Elements of Hindu Iconography SVol.1– Part-1V– New Delhi– 2017
১৫) Nalini Kanta Bhattashali– Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Meseum– Dhaka– 2008
১৬) Enamul Haque– Bengal Sculpture - Hindu Iconography upto C. 1250 A.D.– Dhaka, 1992
১৭) Goutam Sengupta & Sharmila Saha, Vibrant Rock, Government of West Bengal– 2014
১৮) A. L. Basham, The Wonder that was India– London– 2004
১৯) Dr. R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, Tulshi Prakashani, 2005

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শক্তিনাথ ঝা (বহরমপুর), সুভাষ পাণ্ডে (জিয়াগঞ্জ), সাধন মণ্ডল (রামেশ্বরপুর, খড়গ্রাম), দিলীপ চৌধুরী (হরিনারায়ণপুর, খড়গ্রাম) ও অপরেশ চট্টোপাধ্যায় (কান্দি)।

'আনন্দদীপ' পত্রিকার সাফল্য কামনায়

শ্রীগণেশজী

সমস্তরকম খাতা প্রস্তুত করা হয়

সাঁইথিয়া, এফ. সি. আই গোডাউন রোড, বীরভূম
মোবাইল : 9232723022

পরিবর্তনের ধর্ম ও ধর্মের পরিবর্তন

পলাশ সিনহা
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৪

'শাশ্বত'! শাশ্বত মানে চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী বলে কিছু হয় কি? পরিবর্তনকে স্বীকার করলে শাশ্বত-র মূল্য অস্থায়ী হয়ে পড়ে, আর শাশ্বত-কে স্বীকার করলে পরিবর্তন মরীচিকার রূপ ধরে। তাহলে শাশ্বত কিংবা পরিবর্তন — কোনটা সত্য? দুটোই কি একসাথে সত্য? নাকি স্থান এবং কালের সাপেক্ষে একটা সত্য এবং অপরটা ধোঁয়াশা?

পরিবর্তনের রূপরেখা সময়ের সম্মুখে অতীতের তুলনায় বর্তমানের বিচ্যুতিতে প্রকাশিত হয়। সময়ের সাপেক্ষে অপরিবর্তিত অবস্থাকেই শাশ্বত বলে বিবেচনা করা হয়। স্থান-কালের ওপরও নির্ভর করে পরিবর্তনের মাত্রা। এ ব্যাপারে একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। ধরা যাক, তিন বন্ধু একসাথে অনেকদিন কাছাকাছি থাকার পর ক্লাস টুয়েলভ (১২) পাশ করে দুই বন্ধু (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) একসাথে দূরদেশে বহুদিনের জন্য চলে যায়। আর প্রথমজন নিজের দেশেই থেকে যায়। এখন বহু বছর পর তিন বন্ধু আবার একত্রিত হলে, দ্বিতীয় বন্ধুর চোখে তৃতীয় বন্ধুর পরিবর্তন আর প্রথম বন্ধুর চোখে তৃতীয় বন্ধুর পরিবর্তন একই রকম হবে না। কারণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্ধু একসাথে ছিল বলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন শুধু সময়ের সাপেক্ষে। কিন্তু প্রথম এবং তৃতীয় বন্ধুর পারস্পরিক পরিবর্তন স্থান এবং কাল উভয়ের সাপেক্ষে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি পদার্থবিদ্যায় বা গণিতে দ্বিতীয় বন্ধুর চোখে তৃতীয় বন্ধুর পরিবর্তন বা বিপরীতক্রমটিকে partial or local derivative বলে। কিন্তু প্রথম বন্ধুর চোখে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বন্ধুর পরিবর্তন বা বিপরীতক্রমগুলি total derivative হিসেবে গণ্য হবে।

স্থান ও কালের দৈর্ঘ্যের ওপর পরিবর্তনের মাত্রা নির্ভর করে। যদি স্থান-কালের দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয় আর বর্তমানের বিচ্যুতি অতীতের সাপেক্ষে খুব কম হয়, তাহলে পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে অপরিবর্তিত-কেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর সেটা নির্ভর করে বিচারকের উপর। তাহলে প্রশ্ন আসে পরিবর্তন কি নিশ্চিত? যদিও স্থান-কাল, বিচারক ও বিচার্য বিষয়ের উপর পরিবর্তনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। বিচার্য বিষয়টি সজীব বা নির্জীব হতে পারে, হতে পারে বস্তুর ব্যবহার বা ধর্ম, হতে পারে প্রাণীর খাদ্যাভাস, জীবনচক্র বা সামাজিকতা। আরো ব্যাপক আকারে ধরলে বিচার্য বিষয় হতে পারে জীবজগৎ, গ্রহ-উপগ্রহ, সৌরজগৎ, মিল্কিওয়ে বা সমস্ত ইউনিভার্স বা আরো ব্যাপক কিছু। আর সময় বা কাল-এর পরিসরকেও যদি সেকেন্ডের কোটি ভগ্নাংশ থেকে কোটি কোটি সেকেন্ড ধরা হয় তাহলে পরিবর্তন কি শাশ্বত? নাকি, শাশ্বত হল পরিবর্তিত অবস্থার পরিস্ফুরণ? সময়কে কয়েক মাস থেকে কয়েক দশকের (১৯৬০-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে সীমিত রেখে স্থানকে শঙ্কু আকৃতির পরিসর, যার মূল বিন্দু সত্যানন্দ ছাত্রাবাস ধরলে পরিবর্তন বহুরূপী হলেও হোস্টেল বন্ধন অপরিবর্তিত (এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় বন্ধন)। আরও ব্যাখ্যান্তরে গেলে এটা পরিস্ফুট হয় যে, বিশেষ স্থান-কাল এর 'শাশ্বত' পরিবর্তনশীল। কারণ শাশ্বত বলে সেটাই ধরা হয় যা সেই সময়ের বুদ্ধির গোচর এবং যুক্তির সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা যায় জ্ঞানের সীমানায় থেকে। যুক্তির ব্যাখ্যা বিজ্ঞান ভিত্তিক, লজিক্যাল, বা দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং মানুষের দ্বারা নির্দিষ্ট শাশ্বত-র পরিবর্তন স্বাভাবিক যেহেতু যুক্তির ব্যাখ্যা পরিবর্তন হতে পারে জ্ঞানের সীমা পরিবর্তনে। জ্ঞানের চরম সীমানায় পৌঁছে যুক্তি দিয়ে কিছু ব্যাখ্যা করলেই সেটা তখন হয়ত শাশ্বত বা চিরস্থায়ী হতে পারে। জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে যুক্তিসহ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা হল ধাপে ধাপে শাশ্বত-র নিকটে পৌঁছানোর সোপান। জ্ঞানের ধর্ম হচ্ছে

আরও বৃদ্ধি, আর এর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত এবং চিরাচরিত শাশ্বত-র নিরঙ্কুশ সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়।

জ্ঞানের ধর্ম হচ্ছে শাশ্বত নিয়ে প্রশ্ন করা ও শাশ্বত-কে যাচাই করা। অসংলগ্ন ও যুক্তিবিহীন ব্যাখ্যা হলে জ্ঞান পরিবর্তিত অবস্থার আশ্রয় নিয়ে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। আবার পরিবর্তনের ধর্ম হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধি। তাহলে, জ্ঞান এবং পরিবর্তনের মধ্যে যে কোন একটা বাড়লে অপরটা বাড়া অবশ্যম্ভাবী। একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝা যায়—অনেকদিন আগে এটা ভাবা হত যে, কোন পদার্থ বা বস্তুকে ছোট থেকে ছোট করতে করতে এমন অবস্থায় আসবে যখন ওই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থায় আর ওকে ভাঙা যাবে না, এবং ওই ক্ষুদ্রতম কণার (পরমাণু) মধ্যে ওই পদার্থের সমস্ত গুণ বা ধর্ম বজায় থাকবে। যেমন লোহাকে টুকরো টুকরো করতে করতে লোহার পরমাণুতে পৌঁছালে ওই পরমাণুর মধ্যে লোহার সমস্ত গুণ বজায় থাকবে। আর এটাও ভাবা হত যে, লোহার ওই পরমাণুকে আর ভাঙা যাবে না বা পরমাণু থেকে আর কোন ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যাবে না। তখনকার জ্ঞানের হিসেবে সেটাই শাশ্বত ছিল। পরে পরমাণু ভেঙে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন কণা পাওয়া গেল। তাহলে শাশ্বত-র পরিবর্তন হল। যদিও ইলেকট্রন, প্রোটন, এবং নিউট্রন এর মধ্যে ওই পদার্থের কোনো গুণ থাকল না, তবে এটা জানা গেল যে পদার্থের মূলে আছে ওই তিনটি কণা যাদের বিভিন্ন সমন্বয়ে বিভিন্ন পদার্থ তৈরি হয়। তারপরে আরো ক্ষুদ্রতর কণার খোঁজ পাওয়া গেল (কোয়ার্ক), যেগুলোর মিলিত সমন্বয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন, বা নিউট্রন তৈরি হয়। তাহলে জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়, আর শাশ্বত-র মূল ভিত্তি নড়ে ওঠে। বর্তমানে কয়েকশত কোয়ার্ক-এর খোঁজ পাওয়া গেছে এবং আরও ক্ষুদ্রতর কণার খোঁজ পাওয়া গেছে যেগুলো ফান্ডামেন্টাল কণা বলে আজকের দিনে মেনে নেওয়া হয়।

তাহলে, লোহার পরমাণুতে লোহার সমস্ত গুণ বা ধর্ম বজায় থাকে। লোহার পরমাণুকে ভাঙলে আরো ক্ষুদ্রতর অন্য কণা পাওয়া যায়, যেগুলো দিয়ে শুধু লোহা নয় অন্য বস্তুরও গঠন ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ওই ক্ষুদ্রতর অন্য কণাগুলোর মধ্যে লোহার কোন ধর্ম থাকে না। তাহলে, বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয় কে গভীর ভাবে জানতে হলে পরিবর্তিত ধর্ম-কেও মেনে নিতে হয়। সেই রূপ কোন বস্তু বা অবস্থার অন্তর থেকে আরও অন্তরে গেলে ফান্ডামেন্টাল ধারণা পাওয়া যায় যা থেকে সৃষ্টির মূল গঠনের ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু ধর্মকে স্থায়ী বা শাশ্বত ভেবে এগোলে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে না, আদিম যুগেই পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং জ্ঞান প্রয়োগে, যুক্তি দিয়ে যদি পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তাকে স্বীকার করাই হল প্রগতি। তা যদি চিরাচরিত ধর্মের ভিত্তিতে আঘাত করে চূর্ণ করে সেটাও যুক্তিমনস্ক মন নিয়ে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের জ্ঞান সীমিত, তাই শাশ্বত যেমন চিরস্থায়ী নয়, ধর্মও চিরস্থায়ী নয়। বস্তুর মতো মানবজীবন এবং তার জীবন ধারণের ধর্মেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তনের প্রকৃত যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা আর তার অনুরূপ চলার পথই শাশ্বত-র দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মের পরিবর্তনই ধর্ম, স্থায়ী ধর্ম নিশ্চল যা শাশ্বত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ও প্রগতির স্থবিরতাকে স্বীকৃতি দেয়।

ফিরে দেখো—পরাধীনতার দুশো বছর ও বর্তমান সমাজ

রঞ্জিতকুমার সেন
প্রবেশবর্ষ : ২০০২

'স্ব' অর্থাৎ নিজের আর 'অধীনতা' মানে অধীনে থাকা অর্থাৎ নিজের অধীনে থাকাই হল 'স্বাধীনতা'। যেখান প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ ও সুবিধার সত্ত্বাধিকারী হবে। এক কণ্ঠে বলবে—''আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।''

বিশ্বের বহু দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি সুপ্রাচীন দেশ। যে দেশ প্রায় দুশো বছর ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকে আজ ৭৬ বছর হল স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই দেশ এক সময় বহু মূল্যবান ধনসম্পদের ভাণ্ডার ছিল। সহজভাবে বলতে গেলে—

> ''মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায়, মুক্ত বিতরে রঙ্গে
> আমরা বাঙালি বাস করি সেই, তীর্থে বরদবঙ্গে
> বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমলা
> ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গ মুকুট, কিরণে ভুবন আলা
> কোল ভরা যার কনক ধান্য, বুক ভরা যার স্নেহ
> চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
> সাগর যাহার বন্দনা রচে, শত তরঙ্গ ভঙ্গে
> আমরা বাঙালি, বাস করি সেই, বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।''

এই মোদের ভারতবর্ষ। যেখানে রয়েছে 'বরভূধরের' মতো স্থপতি, শ্যাম-কম্বোজের সেই 'ওঙ্কারধাম'। এই ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন অবিনশ্বর বিটপাল আর ধীমান। এই দেশের মাটিরই অজন্তা গুহায় রয়েছে কোনো এক সুপটু পটুয়ার লীলায়িত তুলিকার স্পষ্ট ছবি। ক্রমশ ভারতবর্ষের গভীরে লুকিয়ে থাকা ধন-সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকাশ পেল তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার কাছে। সভ্যতার সংজ্ঞা ভুলে সেইসব দেশ উপনিবেশ গড়তে এল এই ভারতবর্ষে। শক, হুন, পাঠান, মোগল, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাসি এবং তাদের সাথে সাথে আগমন ঘটল ব্রিটিশ শক্তির। ওরা এলো লোহার হাতকড়ি নিয়ে, এলো মানুষ ধরার দল, যাদের সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা। সভ্য ব্রিটিশদের অসভ্য আগ্রাসন, প্রকট হয়ে উঠল ভারতের পটভূমিকায়।

ক্রমশ প্রকাশ পেতে লাগলো তাদের আসল রূপ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেই পলাশির প্রান্তর যেথা বাঙালির খুনে লাল হলো ক্লাইভের খঞ্জর। শুরু হলো ভারতবর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। অত্যাচারিত হতে লাগল ভারতবাসী। শোষণ-পীড়ন অতি মাত্রায় বাড়তে থাকল। ঠিক তখনই এক এক করে জেগে উঠল ভারতবাসী। ভারতের বিভিন্ন অংশে কৃষক ও উপজাতি মানুষজন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকল। এক নবজাগরণের অভ্যুত্থান ঘটল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিস্তার থামানো গেল না কোনোভাবেই। তাই গড়ে উঠল ১৮৪৭ সালে মহাবিদ্রোহ। ব্রিটিশের নতুন নিয়মে বাঙালির সেনাছাউনিতে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। যা বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। গর্জে উঠল মঙ্গল পাণ্ডের রাইফেল, যেটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বার্তা। কিন্তু এর ফলে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু উপড়ে ফেলতে পারল না। এরপর ১৯০১ সালে লর্ড

কার্জন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা নেয় এবং ১৯০৫ সালে তা সাময়িকভাবে ঘোষণা করা হয়। ফলে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান ভাই একজোট হয়ে গাইল—''মোরা একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।''

এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই স্বদেশী আন্দোলনের রূপ নিল। বিপ্লবী পন্থায় ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন সমিতি। সতীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অনুশীলন সমিতি' যা ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করে। এরপর ১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি বাংলার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্যোগ নেন। দুজনে বোমা ছুড়লেন কিন্তু অন্য কেউ মারা গেল। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। তার ফাঁসির আদেশ হলো। গর্জে উঠল ভারতবাসী। মুখে মুখে ধ্বনিত হলো—'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। ফাঁসের কাঠে ঝুলল প্রথম বাঙালি। বিপ্লবী দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। বাংলার যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন জার্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করলেন। বালিশ্বরের সঙ্গীদের নিয়ে সেই অস্ত্র জাহাজ থেকে নামাতে গেলে ইংরেজ বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে শুরু হয় বুড়িবালামের যুদ্ধ। এককালে শুধু ভোজালি হাতে যিনি বাঘ মেরেছিলেন সেই বীর সেদিন দেশমাতার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন হাসতে হাসতে। সামনা-সামনি লড়েছিলেন, কখনো পিছু হটেননি।

মানুষের মনের শক্তি অজেয়। ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে গর্জে উঠল ছাত্র-যুব সহ গোটা চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ইংরেজের সাথে লড়াই-এ জয়ী হয়ে প্রায় তিন দিন 'চট্টগ্রাম' 'স্বাধীন চট্টগ্রাম' রূপে পরিচিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাস্টারদা ধরা পড়লেন এবং ১৯৩৪ সালে ১২ জানুয়ারি মাস্টারদার ফাঁসি হলো। শোনা যায় ফাঁসির আগে মাস্টারদাকে অসীম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। তার দুইপাটি দাঁত হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে দেওয়া হয়। এত অত্যাচার সহ্য করেও তিনি ফাঁসির দড়ি হাসিমুখে বরণ করেন।

বাঙালি তথা ভারতবাসী ভয় ভুলে গেল। গোটা ভারত জুড়ে শুরু হলো জাতীয়তাবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান রচনা করলেন—

''আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দুবেলা—মরার আগে
মরব না, ভাই মরব না।''

রাস্তায় রাস্তায় জ্বলতে থাকল বিদেশি পণ্য, বিদেশি বস্ত্র। শুধুমাত্র বিদ্রোহ-আন্দোলনই নয়, বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিকেরা নিজেদের রচনার মাধ্যমে ব্রিটিশদের ভীত নাড়িয়ে দিতে থাকল। ১৯৩০-এর ৮ই ডিসেম্বর তিন তরুণ বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ আক্রমণ করল রাইটার্স বিল্ডিং। বন্দুকের আওয়াজে গর্জে উঠল রাইটার্স, লুটিয়ে পড়ল সিম্পসন। এরপর রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ বরাবর গর্জে উঠল বিপ্লবীদের গুলির শব্দে। তারপর টেগার্ড সাহেব তার বাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেললেন বিনয়-বাদল-দীনেশকে। বন্দি করা হলো তাদের।

''আহ্বান শোনো আহ্বান
আসে মাঠ ঘাট বন পেরিয়ে
দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে
বন্যার মতো বেরিয়ে।''

এই জাতীয়তাবাদের আহ্বানে শুধুমাত্র সমাজের তরুণেরাই নয়, তার সাথে নারীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বিলিতি পণ্য বয়কট করে বাংলার নারীরা মোটা তাঁতের কাপড় ব্যবহার করতে শুরু করে। বিলাতি লবণ, ওষুধপত্র, কাচের চুড়ি বর্জন করে, মিছিল ও পিকেটিং-এ অংশ নেয়।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, মাস্টারদা সূর্য সেনের মন্ত্রে দীক্ষিত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৫জন সশস্ত্র বিপ্লবীকে নিয়ে পাহাড়তলী রূঢ়কেন ক্লাব আক্রমণ করে, আগুন ধরিয়ে দিলেন। নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সেদিন পুলিশের সামনেই পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছিলেন। এমনই আর এক নারী হলেন, মাতঙ্গিনী হাজরা। যিনি তমলুকের মাটিতে কয়েক হাজার ভারতীয়কে নিয়ে পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করার লক্ষ্যে হেঁটেছিলেন। সেই মহিয়সী পুলিশের নির্মম গুলি চালনা ও লাঠিচার্জ সত্ত্বেও তাঁর হাতের পতাকাটি মাটিতে লুটিয়ে যেতে দেননি।

এমনিভাবেই বাংলার বহু মানুষজন একত্রিত হয়ে

ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন।

সময়টা স্বদেশি যুগ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও এবার ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাতে তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ ভাষায় ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয়। এই সংবাদ পত্রিকাগুলি দেশবাসীকে ভয় ত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানায়। সমগ্র দেশবাসীর মুখ মুখে উচ্চারিত হতে থাকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। তারা এক সুরে বলে ওঠে—

''মাগো যায় যাবে জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম বলে।''

চারিদিকে রণদামামা বেজে উঠেছে, শুরু হয়েছে অস্তিত্বের লড়াই। সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত আন্দোলনগুলি একে একে ব্যর্থতার মুখ দেখলেও সংগ্রামী ভারতবাসী কখনো থেমে থাকেনি। মানুষ বুঝেছিল দাসত্ব শৃঙ্খলে জীবন কাটানোর চেয়ে প্রাণঘাতী লড়াই-ই শ্রেয়। কারণ তাতে স্বাধীনতার স্বাদ আছে তাই বিপ্লবের ডাক দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকলো স্বাধীনতার লক্ষ্যে। বর্গীয় আক্রমণকালে যে নবজাতক মাতৃক্রোড়ে নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে ছিল সেও আজ গর্জে উঠেছে। স্বাধীনতা আর বেশি দূরে নয়। ভারতবর্ষের সকল তরুণ-তরুণী হাতে হাত রেখে লড়াই শুরু করেছে। ভারতবাসী শপথ নেয় দেশ তারা স্বাধীন করবেই, তাতে বাঁচতে হলে বাঁচবে আর মরতে হলে মরবে। ভারতের এই উপনিবেশ বিরোধী ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ক্রমে এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এসময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত গণআন্দোলন চলতে থাকে। একদিকে গণঅভ্যুত্থান অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলন এরই মাঝে এগিয়ে এলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। যাঁর মতে 'Freedom is not given, it is taken' তাই—

''বল বীর
আমি চির উন্নত শির।
আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস।
মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন
আমি ধ্বংস।''

এমনি প্রলয়রূপী সুভাষ ধ্বংস করতে থাকলেন ব্রিটিশদের বিভিন্ন অকাট্য নিয়ম। ওই ব্রিটিশদের কাছে কখনো আত্মবিক্রয় করেননি তিনি। আর এই ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন ব্রিটিশদের বিষনিঃশ্বাস থেকে। এই চিরউদ্দাম অপ্রতিরোধ্য সুভাষকে গৃহবন্দী অবস্থাতেও আটকে রাখতে পারল না ক্ষমতাধারী ব্রিটিশবাহিনী। এরপরই গঠিত হল 'বেঙ্গল ভলিন্টিয়ার্স' আর তারপর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। যেখানে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীরা মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে থাকল। এই অ-দমনীয় যুবশক্তির রথে সারথী সুভাষ। ভারতসত্তার ভবিষ্যৎ সুভাষ চলেছে বিপ্লবের পথে, রক্তের পথে, স্বাধীনতার পথে।

১৯৪৩ সালে ৩০ ডিসেম্বর জাপান সরকারের হাতে থাকা আন্দামান দ্বীপ সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পোর্টব্লেয়ার মাঠে তিরঙ্গা পতাকা তুললেন সুভাষচন্দ্র বসু। এটিই স্বাধীন ভারতের মাটিতে প্রথম তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। INA-এর কমান্ডার ইন চিফ হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। যাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৮টি দেশ। এরপরই 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' ভারত অভিযান শুরু করে। তবে শেষ পর্যন্ত জাপানিদের দ্বারা অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে আজাদ হিন্দ বাহিনী বিকল হয়ে পড়ে, ফলে অসফল হয়। তবুও সুভাষ আজাদ হিন্দ বাহিনীর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন।

অবশেষে বহু রক্তক্ষীয় যুদ্ধে, বহু নিরন্তর সংগ্রাম, বহু স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এলো স্বাধীনতা। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন হলো আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। দেশের তরুণ-তরুণীরা আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়ে গেল—

''সঙ্কেচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
... দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।''

আজ স্বাধীনতা লাভের ৭৬ বছর পার করে ফেলেছি—আজ আর ব্রিটিশ শাসন নেই তবুও সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাধীনতার অবমাননা করার খবর শোনা যায়। সংবাদ মাধ্যমের পাতা খুললেই কোথাও না কোথাও উৎপীড়ন, শাসন, শোষণ প্রতিনিয়ত কালো

কালো অক্ষরে পাতা ঢেকে ফেলছে। তবে কী সত্যিই স্বাধীনতা আজও আসেনি। বহু বিপ্লবীর রক্তে রাঙা এই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ মুক্ত হয়েও কী স্বাধীন নয়! প্রায় দুশো বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশপ্রেমিকেরা যে ভারতবর্ষ ভারতবাসীর হাতে তুলে দিল ওগুলোর তাহলে কী কোনোই মূল্য নেই?

আজ ৭৬ বছর পর তা ভাববার সময় এসেছে। আসুন, আমরা সকলে মিলে আজ অঙ্গীকারবদ্ধ হই যে, আমরা তথা তরুণ যুব সমাজ আমরাই সমাজকে কালিমামুক্ত করব। সৃষ্টির নব মন্ত্রে দিন বদল ঘটিয়ে গড়ব রঙমহল। আমরাই নব প্রজন্মের কাছে এই সমাজকে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরব যার কোনো তুলনাই হয় না—

''যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।''
'বন্দেমাতরম—বন্দে ভারত'

যাঁদের আর্থিক সহযোগিতায় 'আনন্দদীপ' সমৃদ্ধ

	নাম	প্রবেশবর্ষ
১)	অনিমেষ মণ্ডল	(১৯৯৩)
২)	রুদ্রপ্রতাপ মুখার্জী	(১৯৯৯)
৩)	জলদবরণ দত্ত	(১৯৬৬)
৪)	রজত কুমার ব্যানার্জী	(১৯৬৮)
৫)	অরবিন্দ শী	(২০০০)
৬)	দেবদুলাল দাশ	(১৯৮৩)
৭)	পলাশ ব্যানার্জী	(১৯৮৪)
৮)	বিশ্বজিৎ সাহা	(১৯৯৭)
৯)	সন্দীপ দাস	(১৯৮৭)
১০)	কৌশিক ভট্টাচার্য	(২০০৫)
১১)	সুরজিৎ রায়	(১৯৯৫)

প্রেম

সাগর কুমার দাস
প্রবেশবর্ষ ১৯৮৪

ফুলবনে অঞ্জলি লহ প্রভু,
পুষ্প ফুটেছে মনে ফোটেনি তো কভু।
তোমারই দয়ায় প্রভু, এসেছি মায়ায়,
ত্রিভুবন করলে জয় রইব ছায়ায়।

হে তুমি মহাপ্রভু কোথায় কোথায়,
পুষ্প হয়ে ফুটেছ বুঝি আপন কায়ায়।
উঁকি মেরে হৃদয় মাঝারে রইবেন লুকিয়ে
খুঁজে মরি আমি বাইরে মন্দিরে।

আমি খুঁজে বেড়াই

মোহাম্মদ সাদউদ্দিন
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৬

আমার নানিজানের
সেই তসবি খুঁজে বেড়াই
খুঁজতে খুঁজতে আমার চোখ
আকাশে ঠেকে
ঐ তসবির এক একটি দানা
আমার ভারতের বহুত্ত্ববাদী সংস্কৃতি।
আমার নানিজানের
নামাজ পড়া জায়নামাজ
আজো খুঁজে বেড়াই
ওটার উপরে গোপাল মামাকে
বসিয়ে নানি ভাত খাওয়াতেন
ওটা আমি আজো পেলাম না।
চরণকাকুর মা বলতেন
দাদুভাই, মহরমের চাঁদে
জারি-মর্সিয়া শোনাতে আসবে
এখন আমি সেই ঠাকুমাকে
দেখতে পাইনা, কত খুঁজি
তাঁর হাতের পাগল করা খইমুড়ি আর নারকেলের নাড়ু
থেকে আজো বঞ্চিত।
এইসব নানিজান আর ঠাকুমা
আমার স্বদেশভূমির
এক একটি পবিত্র সম্প্রীতি
ভালোবাসা আর
নিষ্কাম প্রেম।

সহরাই

পঙ্কজ মণ্ডল

প্রবেশবর্ষ ১৯৮৬

আমাকে ওরা কথা দিয়েছে বলে গোবরকণার প্রলেপ দিয়ে ঘর মাজি
ছোট বারান্দায় গেঁথে ফেলি শরের কাঠির সারি
সদর দরজায় এঁকে দিই ময়ূর ময়ূরীর পেখম তোলা ছবি
খামারে উঠোনে এঁকে দিই গোরু গোয়ালের আলপনা

আলোর রোশনাই ছড়ানোর জন্য ওরা জোনাক পোকাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে
ভাবনা সেলাই করে করে ওরা গড়ে তুলেছে স্বপ্নের মায়াডোর
ওরাই আমার সোনার কাঠি রুপোর কাঠি ছোঁয়া ভাইবোন

এবার ঘরের সামনের উঠোনে আসর বসবে
ধামসা মাদলের তালে তালে দোবরু পান্না ভানুমতিরা কোমর দুলিয়ে নাচ করবে
খাটে মৌজ করে বসে হাড়িয়ার গ্লাসে চুমুক দিয়ে বোল তুলবে অর্জুন মাড্ডি বাঘা সোরেন

আমাকে ওরা কথা দিয়েছে বলে
বিশ্বাসের জমিতে গড়ে তুলি স্বপ্নের ইমারত
ঘরে তুলে আনি রাঙামাটির সোনালি ধান
লাল পাড় শাড়ি পরে ফুলমনি সন্ধের প্রদীপ জ্বালে

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় সুমধুর শঙ্খউলু
আড়াল বেয়ে উঠে আসে ওই রূপকথার নীলপরী লালপরীর ঝাঁক
তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যায় সহরাই পরব।

অন্ধ জাগো

চঞ্চল রায়চৌধুরী
প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৭

‘একটা গাছ একটা প্রাণ
এই কথাটার দিলে মান
সবাই পাবে রক্ষে’
—শুনে সর্বসমক্ষে
ভবেশ হেসে গড়াগড়ি
বলে, ডেঁপোদের বাড়াবাড়ি
তাই কখনো হয় নাকি
গাছ না কেটে লাভটা কি?
গাছ বেচে তো পেট ভরে
মূর্খরা সব দোষ ধরে।

পরানকাকা ষাট পেরিয়ে এখনো বেশ দিব্য তাজা
সবুজপ্রেমী মনটা নিয়ে আপন মতে, স্বাধীন রাজা!
ইচ্ছে করে বর্তমানের প্রজন্মকে
তার সময়ের গল্প বলে জমিয়ে রাখে
তার সময়ে মুক্তি পেত, একটা গাছে অনেক প্রাণ,
গাছতলাতে বসত সবাই, এই কথাটা বলতে চান।

সেই সময়ে ছিল না তো আজকের এই বিজলী পাখা
ফাঁকা মাঠের দরাজ হাওয়া, তাতেই বেশ তৃপ্ত থাকা
সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, রাতি
হাত পাখাটাই থাকত সাথী
প্রথম যখন বৃষ্টি হত, মনের সুখে ভিজত সবাই
পরব খুশি আনন্দগান, এর বেশি আর কি বা চাই?

দীপক এক নবীন কিশোর
ছিল চুপচাপ মগ্ন বিভোর
নড়েচড়ে সে উঠল এবার
চুপ থাকতে পারল না আর
দাদু বলে, সে কালেতে ভুত আসত সন্ধ্যে হলে
ব্রহ্মদত্যির ডেরা নাকি বেলগাছেতে সবাই বলে
বিজলিবাতি আসার পর কোথায় তারা? উধাও সব
মোবাইলটা আসার পরেই বন্ধ যত গল্পগুজব
আজগুবি সব গল্প দিয়ে সেসব দিনের লোক ঠকানো
সরলতার সুযোগ পেয়ে কুসংস্কার ভয় ধরানো
আজকে দেখি আসুক কেউ
দেখতে পাবে নবীন ঢেউ।

পরানকাকা একটু দমেও আবার উঠে দাঁড়ান সোজা
বসতে পাননা কোথাও যে, মিলবে কোথায় বাতাস তাজা
ব্যস্ত গাড়ি, ব্যস্ত মানুষ, দৌড়াদৌড়ি চলছে খেলা
চারিদিকেই ব্যস্ত সড়ক, শ্বাসপ্রশ্বাস বিষম জ্বালা
সবুজ মাঠ, সবুজ বন, চোখেই তেমন পড়ে না আর
টিকিট কেটে পার্কে গেলে, কয়েক কণা মিলবে তার

বিশাল বিশাল অট্টালিকা, ফাঁকা মাঠে জুড়ছে বসে
চোখের এত জোর নেইকো, কারা হেথায় থাকবে এসে?
‘সবুজ বিদায়’ শিল্পায়নে প্রকৃতির আজ বিরূপ প্রভাব
‘জল সংকট’—মূলেই আছে অর্থলোভীর চেতনা অভাব
বন জঙ্গল পাহাড় মাটি বাদ দিলে আর থাকবে কি ছাই!
ভূ প্রকৃতি রুষ্ট হলে, নষ্ট মানব সভ্যতাটাই
পরানকাকা কিশোর নবীন কারো কথাই ফেলনা নয়
বিপদ এখন দোরগোড়াতে, এসেছে ভাই ভাবার সময়
ভবেশদেরকে ভয় নেই ভাই, বুদ্ধিমানরা সজাগ হও,
অন্ধ যারা ঘুমিয়ে আছো, জাগো এবার, এগিয়ে যাও।

পুরানো সেই সিনের কথা

তাপস সাহা
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯২

বাপিদার সেই চায়ের দোকান,
দরমা দেওয়া ঘর,
সদা হাসি খোশমেজাজি,
অম্লান অন্তর।
কলেজ আমার টুকরো সোনা
যায় কি তাকে ভোলা?
সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের,
স্মৃতি আছে তোলা।
নিতাইদাকে মনে পড়ে
চটপটি চাট খাসা,
আর বিশুদা, সবার প্রিয়,
ছাত্রাবাসে বাসা
পা টলমল গা ঝলমল
ঘোষালদা থাক মনে,
সরল ডালিম তুলনা নাই
বলছি জনে জনে।
আর ট্যাম্পা টেম্পারেচারে
ডাইনিং রুম সাজল।
আলুর ঘ্যাট আর ভাত সে মজা
ন'টায় ঘন্টা বাজল।
তিনটে তাপস বাঙলা নিয়ে
ছাত্রাবাসের রত্ন,
সাহা-লায়েক-অধিকারী,
সবার পেত যত্ন।
টিভি রুমের গল্প অনেক,
বলতে বছর পার,
ডাইনিং-এর ভালোবাসা,
সারা জীবন ধার।
অপরাহ্নে কলেজ ফিরে,
ব্যাট আর বলের খেলা।
কোমর বেঁধে দলে দলে,
গিয়েছিলাম মেলা।
পিকনিক—সে বলব কি আর,
পাগলামি ধূমধাম,
ছাত্রাবাসের কোলাহলে,
কাঁপে শহর গ্রাম।
প্রথম বর্ষে ম্যানেজারি
তিন তাপসের শুরু,
মাসের শেষে ভুরিভোজ,
কি বলব গুরু!
সূর্য গেল অস্তাচলে
ফেয়ারওয়েলের দিন
চোখের জলে বিদায় তোমায়
তোমার কাছে ঋণ।

সহবাস

বিমল চৌধুরী

(প্রাক্তন আবাসিক, প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৮)

জননী ধরা,
তোমার কোমল বাহুবন্ধন,
তোমার দৃষ্টিতে আকর্ষণ, আহ্বান।

সারাদিনের পরিশ্রম শেষে—
সূর্য লুকাতে চায় তোমার আঁচলতলে,
নিবিড় ভালোবাসায়।
তার পৌরুষ—তোমার স্নিগ্ধ কোমলতাকে নিংড়ে দিতে চায়।
তার উদ্দাম প্রেমের তেজে তোমার শরীর দগ্ধ,
শিহরিত মন প্রাণ।
আজীবন-অনন্তকাল।
আর আমরা?
অসংখ্য ক্লোরোফিল কণা আর রক্ত মংসপিণ্ড—
তোমাদের ভালোবাসার ধন।
তোমাদের আত্মজ প্রেমের সাক্ষী।

সুচেতনা

অনিরুদ্ধ দাস

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৪

আলোর চিরকুট (এলো) চলে গেল
বদ্ধ জানালার ওপাশে গালিচায়

আলো নিভিয়ে আঁধার আসে
দিগন্তের বালিহাঁসের হাত ধরে
মীনকন্যার রাঙামুখ দেখে জলে নামতে যায়
মরণ হোক চিতা জ্বলুক দেহাতীত আগুনের নাভিমূলে
রূপের বিচিত্র স্কাইলাইট উঠলে
সসাগরা আঁধার কি বা করতে পারে
মনের মাইল জুড়ে কাঁঠালজবা খেলা করে
পৌষের রাত খেলা করে জাফরানী শরীরে
সুচেতনা! ওখানে সবুজদ্বীপ নীল নির্জন
মানুষ ভালবেসে ধানের গাই ঝুলিয়েছে
জানি ফসল কাটা হবে
গোখুরের দূর্বা কি ভুলে যায়
তাঁর পাউস বিছানায় অনন্ত সুখ

সুচেতনা! আমি যাব
তোমার হৃদ-হিজল অনন্ত নাভিমূলে
ফাল্গুনের প্রান্তরে চিল উড়ে যায়
অশোক পলাশের ডাগর কাঁখে
সুচেতনা! আমি যাব
তোমার হৃদ-হিজল—অনন্ত নাভিমূলে

উদাসীন সময়

ওয়াকিফ মোহাম্মদ সাহিন

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫

কত কিছু ঘটে যায়
ঘটনার ঘনঘটায়
এ আর এমনকি শুধু
তোমার চলে যাওয়া।
দিন শেষে রাত আসে
রাত এসে বলে যায়
আগামীর প্রয়োজনে
ছেড়ে যেতে দ্বিধা নাই।
কার যাওয়া বেদনার
কার মনে কত ছাপ
রেখে গেল স্পষ্ট
সময়ের ধারারেখ
ধুয়ে দেয় যত সব
আবেগ ভালোবাসা দুঃখ কি কষ্ট।
আরো যত অনুভূত
নেই কোন দাম তারও
সময় বয়ে চলে উদাসীন অনন্ত।

নামকরণ

আবু তাহের মাসুম রাজা

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৬

‘হাঁসু’ বলে কমলেশকে
সবাই তাহা জানি
জোড়া ‘ঢোল’ আছে হেথায়
মানস এবং অনি
মালদার ঐ ‘ঝন্টু’ সাহিন
ভালো এবং কালো
আওলাদদার বাংলাদেশী
গান শুনতে ভালো
আমাদের বন্ধু বিধান
‘সুঁচ’ নামেই থাক
খামখেয়ালি নিশারুদ্দীন
‘বাবা লোকনাথ’
হোস্টেলেই ছিল ‘ফকা’
নামটি জহিরুল
‘বিহারী’ ব্যাটা ইমদাদুল
মারত ব্যাপক গুল
‘জগাই মাধাই’ লয়েড বুবাই
এক রুমেতে থাকে
‘জ্ঞানদাস’ পলাশদা রোজ
জ্ঞানেই ভাত মাখে
আমিও ছিলাম ওদের মাঝে
‘দাঁতন’ নামে জানো
নামে কিছুই যায় আসে না
বন্ধুত্বেই চিনো ...

শুভলগ্ন

জহুরুল ইসলাম

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৬

বাইরে তুমুল উৎসব
আলোর রোশনাই, সানাই-এর সুর
যুবক-যুবতীরা কলহাস্যে মুখর

অথচ ভিতরে
ব্লেড, রক্তপাত
উথলে উথলে ওঠে বোবা কান্না।

মেয়ে কনে সাজে
ঝলসে ওঠে রূপ, বিদ্যুৎ খেলে যায়
আশ্চর্য দক্ষতায় বুনে দিচ্ছে সংসার

অথচ ভিতরে
প্রচণ্ড বিস্ফোরণ
জন্ম-নাড়ী পুড়ে যায়, দগ্ধতায়।

উলুধ্বনি, ছড়ানো খই
সেজে ওঠে বরণডালা
মুখে চিলতে হাসি

অথচ ভিতরে
ধূ-ধূ মরুভূমি
আঁচল খসে পড়লেই
হা হা বুক!

প্রণয়ের উদ্বোধন

মুরারী কৃষ্ণ সাহা

প্রবেশবর্ষ : ২০০০

প্রণয় কি একটা সুখের স্থান,
জোগে তুমি আমার হৃদয়ের বন্ধন,
হারানো তুমি সৃষ্টির সুখ এবং দুঃখ,
মনে আমার তুমি প্রণয়ের উদ্বোধন!
প্রণয়ের পাঠশালা হল হৃদয়,
প্রণয়ের মূল্য হল প্রশ্নের উত্তর,
প্রণয়ের উপাদান হল স্বপ্নের আশ্রয়,
তুমি আমার প্রণয়ের উদ্বোধন!
প্রণয়ের লালন হল প্রণয়ের শ্রদ্ধা,
প্রণয়ের তৃপ্তি হল মনের স্থানের উপর,
প্রণয়ের পরে হল তুমি তুমি মাতৃত্বে,
মনে আমার।

Sensation

Hafizul Kabir
Entry year : 2004

Like a dormant volcano,
After a few years of sleeping, it reopens
With the attraction of your fragrance.
I know you pant for the lack of loxygen
Because it's none but your adolescence.
O'my dear don't jump into the fire
Like a butterfly, seems it flower.

You are immature, you are unaware
You do not know what reality are.
The way you want to sail your ship
Is full of storms and grief.
Before you a million of Romeo & Juliet
Has already crossed this perilous sea
But still this path is not easy.

It's my duty to show you the right path
Whatever I am the person whom you love.
Have you ever seen, the flower which blooms quickly
That loses its glamour rapidly;
But, the flower which blooms gradually
That keeps its fragrance and beauty for the longevity?
Try to be a flower like that.

গল্প শুধু গল্পই হয়

কমলেশ ঘোষ

প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫

বাঁকুড়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে আমি। আমার নাম পবিত্র ভট্টাচার্য। আমার দাদু আমার নামকরণ করেছিলেন। বলেছিলেন তার নাতি একদিন আকাশ, বাতাস এবং জলের মতো পবিত্র হবে। যাইহোক, যজমানী ছিল আমাদের বংশগত পেশা। পৈতৃক বাড়িটা বেশ বড়সড় হলেও, ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন টানাটানির সংসার আমাদের।

আমি গ্রামের পাঠশালায় এক বটগাছের তলায় বসে পড়াশোনা করেছি। বর্ষায় স্কুল বন্ধ থাকত। স্কুলের পড়া শেষ করে দূর কলেজ থেকে বিএ পাস করেছি। তারপর পাশের গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে দিলেন। এরপর একে একে মা বাবা দাদু গত হলেন। স্ত্রী রেবা আর এক বছরের সন্তানকে বাড়িতে রেখে আমি চাকরির উদ্দেশ্যে গুজরাট চলে গেলাম।

চাকরিটা ছিল এক বেসরকারি সংস্থায়। বছরখানেক চাকরি করার পর স্থির করলাম বউ-বাচ্চাকে কাছে নিয়ে আসব। নাহলে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তাদের খোঁজ খবর পেতাম খুব কম। তখন মোবাইলের যুগ ছিল না। গুজরাট থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে এল। বাড়ির কাছে আসতেই মনটা খুশিতে ভরে গেল। আর দরজায় হাত দিতে দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। ডাকলাম, 'খোকা, রেবা।' সাড়া নেই। বোধহয় ভেতরে আছে। মনে পড়ল, আমাদের গ্রামের পুকুরে কতদিন স্নান করিনি। হোক সন্ধ্যে, রেবার উদ্দেশ্য চেঁচিয়ে বললাম, 'আমি পুকুরে স্নান করে আসছি তুমি আমার খাবার ঠিক করো'। তাও কোনো সাড়া নেই কারো। ব্যাপারটা কি? রান্নাঘরের দিকে যেতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। ছোটবেলায় শোনা গল্পের ঘটনা চোখের সামনে দেখছি। দেখলাম, রেবা তার একটা পা উনুনে ভরে দিয়েছে। আর অন্য দিকে ঘরে বসেই বাগান থেকে লেবু পাড়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে আমি এক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায়। একটু দৌড়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফিরলে অন্ধকারের মধ্যে কিছু লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কাছে আসলে বুঝলাম আমার প্রতিবেশী সুরেন, কমল, বাবলুদা, মনিকাকা এরাই। আমাকে দেখে চিনতে পেরে সুরেন বলল, 'এ তো আমাদের পবিত্রদা'। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা এত রাত্রে কোথা থেকে আসছ?' সুরেন বলল, ''আমরা তো তোমার বউ ছেলেকে দাহ করে গ্রামে ফিরছি। তারা গতকাল কলেরায় মারা গিয়েছে। আমরা তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। তুমি পাওনি?''

আমি আর কোনো কথা বললাম না। উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম। কাছেই স্টেশন। সেখানে তখন নিভু নিভু আলো জ্বলছে। একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। আমি একটা কামরায় উঠে পড়লাম। কামরায় কোনো যাত্রী নাই। কেবলমাত্র একজন মহিলা বসে আছে। আমাকে দেখে যেন লজ্জায় ঘোমটা টেনে দিল। আমি সদ্য স্ত্রী ও সন্তান হারা। দিশাহারা অবস্থা। কি করব, কোথায় যাব জানিনা। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। একটু পরে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখলাম, সেই মহিলা ট্রেন থেকে কখন যেন পাশের জমিতে নেমে গিয়েছে। এদিকে তার ব্যাগটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে মনে হল। ট্রেন তখন ছুটছে। আমি জোরে ডাকলাম, কিন্তু মহিলা আলপথ ধরে হেঁটে চলে গেল। একবারও ফিরে তাকাল না। ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে। লক্ষ্য করলাম ব্যাগটা তো

আমারই। ব্যাগটা খুললাম, দেখলাম আমারই দরকারি জিনিসপত্র। টাকার ব্যাগ, বাড়ির দলিল, পেন, কাগজ।

রেবা ছোট থেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিল। গরিব ঘরের মেয়ে। তাই পড়াশোনা না করিয়েই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল বাড়ির লোক। আমাকে মাঝে মাঝে বলত, আমাদের বাড়িটা তো বড়, তাই কিছুটা অংশ স্কুলকে দান করলে হয় না? রেবা তুমি কি তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে গেলে? আমি আর গ্রামে ফিরব না। কিন্তু তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করবই। আর সেই স্কুলের নাম হবে 'রেবা স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়'।

'আনন্দদীপ' পত্রিকার সাফল্য কামনায়

Paritosh Mondal

(Entry Year : 1982)

AMFI Registered MUTUAL FUND

Distributor : ARN–61781

Mobile : 8016280307, 8250767663
E-mail : pmondal.nj@gmail.com

Unique Tiny URL for E-MF Account Opening
http:/p.njw.bz/58977.

যখন রাতের কুয়াশারা...

সুরজিৎ রায়
প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৫

''কবে ফিরলে জয়দীপদা? পুরোপুরি নাকি?'' গলাটা চেনা ঠেকলেও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল না জয়দীপ। ঘাড় ঘুরিয়ে বুঝল।

''এইত্ত মাস খানেক, ফিরিনি রে, দু'মাসের ছুটিতে। কেমন আছিস বিপুল? এখনো স্কুলে নাকি কলেজে?''

''কোথায় আর যাব, দাদা। তুমি সেই যে কানেক্‌টিকাট না ওরেগন চলে গেলে, একেবারে গন তো গন।'' একগাল হেসে এগিয়ে এল বিপুল, ''তুমি উড়ে গন, আমরা আম জনগণ, তোমার মত ডানা আর পেলাম কই?''

''ওড়ার ইচ্ছেটা আগে দরকার, ডানার জোগাড় হয়ে যায়। ওড়াকে এখনো এত বড় ব্যাপার ভাবিস? চল ছাদে গিয়ে ধোঁয়া ওড়াই।''

কলেজ হোস্টেলে রিইউনিয়ন জয়দীপদের। কয়েক বছর হল শুরু হয়েছে। জয়দীপ এই প্রথমবার। হোস্টেল ছাড়ার কুড়ি বছর পর হোস্টেলে পা। মাত্র একমাস আগে আমেরিকা থেকে এসেছে জয়দীপ। তাও মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে। অল্প কয়েকজন ছাড়া যোগাযোগ ছিল না প্রায় কারো সঙ্গেই। আতিয়ার হঠাৎ কাল টেক্সট করল, ''আমাদের সত্যচরণ ছাত্রাবাস, উনত্রিশ নম্বর রুম, মনে আছে? সুজন, চিনু, অতনু, উজ্জ্বল, হাসান—এদের দেখতে চাস তো কাল চলে আয় হোস্টেলে''। মাকে বলেছিল জয়দীপ কথাটা। সব নাম, মুখ মায়ের চেনা। হোস্টেল থেকে সুজন আতিয়াররা কতবার ওদের গ্রামের বাড়ি গেছে। মনে পড়ে গেল সবকিছু। অনেকক্ষণ গল্প হল মায়ের সঙ্গে আজ ওর হোস্টেল নিয়ে, গ্রামের বাড়ি নিয়ে। গ্রামের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে অনেকদিন। এখন এই কলকাতায় ভাইয়ের বাড়িতে সারাদিন মায়ের বিছানার পাশে বসে থাকে জয়দীপ। মায়ের শরীর একদম ভাল নেই। অ্যাডিনোকার্সিনোমা, ফোর্থ স্টেজ। মাঝে মাঝে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে। তবু মায়ের জোরাজুরিতে জয়দীপ সেদিনই লুপ লাইনের রাতের ট্রেনে চড়ে বসল। ট্রেন নয়, জয়দীপের কাছে এ যেন টাইম মেশিন। এক রাতের সফরে কুড়ি বছর অতীতে।

মফঃস্বল শহরের একমাত্র কলেজ গোবিন্দপুর মহাবিদ্যালয়। স্টেশনে যখন নামল জয়দীপ, আবছা কুয়াশার চাদর গায়ে দেওয়া সবে-আলো-ফোটা ভোর ওকে স্বাগত জানাল। রাস্তাটা যেন বহু জন্মের চেনা। হাঁটতে হাঁটতে কোথাও কি সাইনবোর্ডে 'স্মৃতিপথ' বা 'মেমোরি লেন' লেখা দেখল? জয়দীপের জীবনে কুড়ি বছর পর এ এক অন্য ভোর, অন্য স্পেস-টাইম। থমকে দাঁড়াল জয়দীপ কলেজ গ্রাউন্ডে। ডিসেম্বরের আধো কুয়াশায় হোস্টেল বিল্ডিং যেন অলীক আবছায়ার ব্যাকগ্রাউন্ডে এক অপার্থিব ওয়াশ পেইন্টিং। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে চারপাশ অনুভব করল জয়দীপ। তারপর ভরামাঠ ভোরের শিশিরে পায়ের ছাপ এঁকে এগিয়ে চলল।

''দাদা, মায়ের শরীরটা ভাল নেই রে'', ভাই ফিসফিস করে বলেছিল। আজ থেকে ঠিক দু'মাস আগে। মেটাস্ট্যাসিস ধরা পড়েছে। প্রতিদিন ফোনে কথা হয় মা'র সঙ্গে, বলেনি একদিনও। হয়ত বুঝতে পারত কিছু, জানাত না। এখন ব্যাপারটা জানে সেটা বুঝতে দেয় না। একমাত্র শেকড়ে কেমন যেন টান অনুভব করেছিল জয়দীপ। মানুষের দুটো মাত্র শেকড়। দশ বছর আগে বাবার শেষ নিঃশ্বাস যখন ওর গ্রামের বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে, ও তখন পোর্টল্যান্ড ইউনিভার্সিটি সেমিনার হলে। পোস্ট ডক্টরেটের কাজে ব্যস্ততার শিখরে। বাবার সঙ্গে শেষ দেখাটা হয়নি।

''এখনো বিয়ে করলি না। বাবা মারা যাওয়ার পর কাঁদার সময় পাসনি। তুই পাথর না পলিয়েস্টার না পিওর

পাগলা বোঝা মুশকিল।" সুজনের কথার ধরণ এই চল্লিশ বছর বয়সেও বদলায়নি। আতিয়ার, উজ্জ্বল, চিনু, হাসান, অতনু, প্রদীপদা অনেকেই ছাদে চলে এসেছে। হোস্টেলের সামনের মাঠে জুনিয়র প্রাক্তনীদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। ছাদ থেকে দেখা যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় জয়দীপ নেই। তাই একটু সময় লাগছে চেহারাগুলো চিনতে। কিন্তু মানুষগুলো সবাই চেনা, সবাই কাছের। জীবনের এক দুরন্ত সময়ের একান্ত মানুষ সব। ছাদে বসে রোদে পিঠ দিয়ে সবাই জয়দীপের কথা শুনছিল।

চিনু বলল, ''দুঃখ পাস না জয়, শেষ দেখা দেখতে পেলেই কি সব দেখা শেষ হয়? তারপরেও মনের ভেতরে কাকুকে দেখিসনি কি একবারও?"

জয়দীপ আলতো হেসে চিনুর পিঠে হাত বোলাল। বলল, ''চিনু, লিখছিস এখনও?"

''তোর মত শ্রোতা আর পেলাম কই?" চিনু মাঠের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল।

সুজন ফুট কাটল, ''লিখছে মানে, সকালে ছোট্ট একটা কবিতা বানিয়ে উনুনে দিয়ে দেয়। তারপর পরপর কুড়িটা কবিতা বানিয়ে থামে। তারপর কবিতাগুলো..." চিনু চেঁচিয়ে উঠল, ''সুজন, আমাকে নিয়ে বললি ঠিক আছে, কবিতা নিয়ে কথা বললে তোর মুখ স্টেপল করে দেব। ব্যাগে স্টেপলার আছে।"

মাঠে খেলা জমে উঠেছে। দর্শকরা ছাদে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। জয়দীপ আপটুডেট হচ্ছে আস্তে আস্তে সবার জীবনের সঙ্গে। ধোঁয়াটে অতীত মনে পড়ছে।

তখন জয়দীপ সেকেন্ড ইয়ার। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার কয়েকদিন আগে। এখানে এই ছাদে বসেছিল সেদিন কুশলদা, আতিয়ার, সুজন আর ও। পার্ট ওয়ানে ফার্স্ট ক্লাস, কলেজে এজিএস, ক্রিকেটে তুখোড় কুশলদা। ওর সঙ্গ দারুন লাগত। জমাট পড়ার মাঝে রাত বারোটায় দশ মিনিটের SB, স্মোকিং ব্রেক। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল জয়দীপ। তখন মোবাইল আসেনি, আতিয়ার সুজনরা সেই মাঝরাতে কোথা থেকে একটা সিমেন্ট বওয়ার প্যাডেল ভ্যান জোগাড় করেছিল। কুশলদার নেতৃত্বে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাত্রেই। অ্যাকিউট অ্যানিমিয়া। এক বোতল রক্ত লেগেছিল। সদর হাসপাতাল থেকে আনা হয়েছিল। ব্লাড ব্যাংক ডোনার ছাড়া দেবে না। কুশলদা দিয়েছিল রক্ত। তখন জয়দীপদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। হাসপাতাল থেকে সাতদিন পর ছাড়া পেয়ে হোস্টেলেই ফিরেছিল।

''কুশলদা কোথায় আছে রে?" জয়দীপ জিজ্ঞেস করল।

''নেই। আর ছ'মাস আগে হলে দেখতে পেতিস। লাং ক্যান্সার।" আতিয়ার বলল। সবার কথা যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। সামনের নারকেল গাছে একটা বুলবুলি ডাকছে কেবল।

মাঠের খেলা শেষ। নিচে চারিদিক ঘেরা হোস্টেল বিল্ডিং এর মাঝের ছোট্ট মঞ্চে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান শুরু হবে। মাইক টেস্টিং চলছে। সবাই নেমে যাচ্ছে। আতিয়ার ঘুরে জয়দীপের দিকে তাকাল। বলল, ''সবাইকে কাছে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই, জয়। দূরে থাকলেও পাশে থাকা যায়। ...চল নিচে যাই, লাঞ্চ হয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে।" আতিয়ারের অভিমানের তীব্রতা ছুঁয়ে গেল জয়দীপকে।

ছাত্রাবাসে প্রবেশবর্ষ ধরে ধরে প্রাক্তনীরা মঞ্চে আসছে। প্রত্যেকে কিছু বলছে। কবিতা, গান, স্মৃতি, মজা। মঞ্চের সামনে চেয়ারে চেয়ারে চলছে জীবনতথ্যের আদান প্রদান, লাইভ ভিডিও, অজস্র সেলফি, গ্রুপফি।

বেশ কিছুক্ষণ পর জয়দীপ মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। ''জয়ের মুখটা হঠাৎ থমথমে মনে হচ্ছে না?" বলল আতিয়ার। চিনু, উজ্জ্বলও মাথা নাড়ল। সুজন বলল, ''নতুন প্রোগ্রেসিভ লেন্স চশমা নিয়েছিস না আতি? ওসব ভুলভাল এখন দেখবি।"

''আমরা যারা চল্লিশের কোঠায় তাদের অর্ধেক জীবনের মৃত্যু হয়েছে। নিজেদের অর্ধেক জীবনের জন্যে দু'মিনিট নীরবতা পালন হবে নাকি?" জয়দীপের কথায় যেন ঝটকা লাগল। কার জন্য? কি হবে? মোবাইলমগ্নরাও মুখ তুলল।

''মৃত্যুর পরেই তো জীবন সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলা হয়। আজ সেই পূর্বজীবন সম্পর্কে ভালো কথা বলা হচ্ছে। যাইহোক, তাহলে বাকি অর্ধেক জীবনও একদিন শেষ হবে। কবে? শরীরের মৃত্যুদিনে?" মজা করছে না, জয়দীপের মুখে হাসি নেই। ফটোশিকারিরা মুখের সামনে থেকে মোবাইল সরিয়ে খালি চোখে দেখছে

জয়দীপকে।

''আমার প্রিয় দাদা, বন্ধু, ভাইরা—আমার প্রিয় রেডিওঅ্যাকটিভ এলিমেন্টস। শুনে রাখো, আমাদের কোনো মৃত্যু নেই। আমরা অনেকেই জীবনের অর্ধেক পেরিয়েছি, কিন্তু বাকি অর্ধেকের শেষ নেই। আমরা সবাই এক একটা তেজস্ক্রিয় মৌল বা রেডিওঅ্যাকটিভ এলিমেন্টসের মত জ্যোতির্ময়। তেজস্ক্রিয় মৌলদের মতো অর্ধায়ু বা হাফ লাইফ আছে, কিন্তু ফুল লাইফ অসীম। তুলনাটা একেবারে নিখুঁত না হলেও আজ হঠাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সঙ্গে আমাদের সবার জীবনের মিল খুঁজে পেলাম, জানো। আমাদের পূর্ণ জীবন সময়ের পরিমাপে আসে না। শরীর চলে গেলেও থেকে যায় অস্তিত্ব। অসীম, অনন্ত সময় ধরে বয়ে চলে রেডিওঅ্যাকটিভ মেটিরিয়ালের মত জীবন। যেমন কুশলদা, দ্য রেডিয়্যান্ট পারসোন্যালিটি। কুশলদা কোনোদিন ফুরোবে না এই ছাত্রাবাসে। আমরাও ফুরোব না কোনোদিন কেউ। আমাদের কাজের মধ্যে, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে, স্মৃতিচারণের ভেতরে মানুষ মৃত্যুঞ্জয়। কবিগুরু কবেই বলেছেন, এই অসীম বিশ্বের দৃষ্টিতে মৃত্যু, দুঃখ, বিচ্ছেদ কোথাও নেই। আমি আমাদের রিইউনিয়নে এই প্রথমবার এলাম। এখানেই কথা দিলাম, পাশে থাকব আগামী দিনে।'' কথার শেষদিকে জয়দীপের গলাটা ধরা ধরা শোনাল। সুজনও কেমন যেন গম্ভীর।

আলো কমে এসেছে। সবচেয়ে লম্বা নারকেল গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল জয়দীপ। সবার বাড়ি ফেরার পালা। কোলাকুলি, হ্যান্ডশেক। বিপুল বলল, ''তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব দাদা, ছেলেটা বড় হচ্ছে। ওদিকে ফিরছ কবে?'' জয়দীপ আলতো হেসে বলল, ''কোনদিকে ফিরব জানিনা। উড়ে গেলে, উড়েই ফিরতে হয় রে। তখন বুকে সাহস আর ডানায় জোর লাগে আরও বেশি। যোগাযোগ থাকবে বিপুল।'' বিপুল বোকাবোকা তাকিয়ে ''আসি গো'' বলে এগিয়ে গেল।

আতিয়ার পাশে এসে বলল, ''কিরে, ট্রেন কখন?'' জয়দীপ মোবাইলটা এগিয়ে দেখাল। ভাইয়ের মেসেজ - মায়ের শ্বাসকষ্ট খুব বেড়েছে, তাড়াতাড়ি আয়।

''মেসেজ তো দেড় ঘণ্টা আগে এসেছে। তোর স্টেজে ওঠার আগেই। বেরিয়ে যাসনি কেন? চল বেরই।'' আতিয়ার বেরনোর জন্য ব্যাস্ত। জয়দীপ বলল, ''একটু দাঁড়া আতি। লোডশেডিং হলে এখানে দাঁড়িয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে তারাভরা আকাশ দেখতাম। ভিনসেন্ট ভ্যানগঘ মনে হতো নিজেকে। একবার ছাদে শুয়ে দেখেছি উল্কাবৃষ্টি। কয়েকটা তারা উঠুক। একটু দেখে যাই।'' আতিয়ার দৌড়ে গিয়ে চিনু সুজনদের ডেকে নিল। জয়দীপের মোবাইল থেকে নিল ওর ভাইয়ের ফোন নম্বর। সন্ধ্যে ঘন হয়ে আসছে। জয়দীপ নারকেল গাছে ঠেস দিয়ে গাছের ফাঁকের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে, ''আমি সুস্থ হয়ে ফিরলাম। এখানে কুশলদার সঙ্গে থালা বাজিয়ে কি নাচ আমাদের! মনে আছে আতি?'' আতিয়ার তখন জয়দীপের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে, ''কখন? ... আমরা যাচ্ছি, চিন্তা করিস না ভাই সবাই আছি ... দাদাকে না, আমাকে কল করবি''। চিনু, সুজন, উজ্জ্বল, হাসান, অতনু সবাই মিলে জয়দীপের চারপাশে এসে দাঁড়াল।

শেকড় তো বাইরে থেকে দেখা যায় না, কাণ্ডের সমস্ত কর্মকাণ্ড অলক্ষ্যে ধরে রাখে। আজ হোস্টেলে এসে জয়দীপ আবিষ্কার করল ওর অনেক শেকড়। সেই সমস্ত শেকড়পথে ওঠা লবণাক্ত জল ওর দু'গাল বেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সমস্ত পশ্চিমী ম্যানার্স, কর্পোরেট ডিপ্লোম্যাসি ভেঙে, সব অন্তর্মুখীনতা টপকে।

তখন, রাতের কুয়াশারা নামতে শুরু করল পৃথিবীতে। আর, রাত হাঁটতে শুরু করল ভোরের দিকে।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীবৃন্দ

(তথ্য সংগ্রহের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও এই তালিকা অসম্পূর্ণ। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।)

১৯৬৬

ইউ ই : জলদবরণ দত্ত

১৯৬৭

ব্যাচেলর : অনুপ মিত্র
ব্যাচেলর : প্রদীপ কুমার ঘোষ
ব্যাচেলর : সঞ্জীব কুমার ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : শিবপদ কবিরাজ
ব্যাচেলর : অশোক কুমার ব্যানার্জী
ব্যাচেলর : প্রভাত কুমার চক্রবর্তী
ব্যাচেলর : রাসবিহারী ব্যানার্জী

১৯৬৮

ব্যাচেলর : রজত কুমার ব্যানার্জী

১৯৭১

ব্যাচেলর : মোহিত কুমার চক্রবর্তী
ব্যাচেলর : পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

১৯৭৫

ব্যাচেলর : অনাথনাথ ঘোষ
ব্যাচেলর : দিলীপ সরকার
ব্যাচেলর : দেবনারায়ণ ব্যানার্জী
ব্যাচেলর : দিলীপ পাল

১৯৭৭

ব্যাচেলর : মলয় কুমার ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : নির্মল সাহু

১৯৭৯

ব্যাচেলর : তুষার মজুমদার
ব্যাচেলর : তপন কুমার সিং

১৯৮০

ব্যাচেলর : আশিস কুমার মুখার্জী
ব্যাচেলর : তুষার মজুমদার
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ কুমাইরুদ্দিন শেখ
ব্যাচেলর : সুশান্ত কুমার রায়
ব্যাচেলর : মলয় ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : তুষার ভট্টাচার্য

১৯৮১

ব্যাচেলর : মুন্সি জি মুস্তাফা
ব্যাচেলর : আব্দুল আহাদ শেখ
ব্যাচেলর : অদ্যানাথ ঘোষ
ব্যাচেলর : গৌতম পাল
ব্যাচেলর : হাফিজুদ্দিন আহমেদ
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ আনসার আলী মল্লিক
ব্যাচেলর : ভূমানন্দ সিনহা

১৯৮২

ব্যাচেলর : নবকুমার ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : নবকুমার কুন্ডু
ব্যাচেলর : পূর্ণাশিস ঘোষাল
ব্যাচেলর : শেখ নিজামুদ্দিন
ব্যাচেলর : সুব্রত ঘোষ
ব্যাচেলর : সুনীল ঘোষ
ব্যাচেলর : স্বপন কুমার সাহা
ব্যাচেলর : ইফতিকার হোসেন
ব্যাচেলর : গৌতম কুমার মণ্ডল
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ গোলাম নবী
উচ্চ মাধ্যমিক : শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়
ব্যাচেলর : অতীশ দীপঙ্কর দে
ব্যাচেলর : ত্রিলোকনাথ দত্ত
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
ব্যাচেলর : শ্যামাসুদন মুখার্জী
ব্যাচেলর : পরিতোষ মণ্ডল
ব্যাচেলর : কাঞ্চন কুমার ঘোষ

১৯৮৩

ব্যাচেলর : আলমগীর মণ্ডল
ব্যাচেলর : বনমালী মণ্ডল
ব্যাচেলর : দিলীপ কুমার সাহা
উচ্চ মাধ্যমিক : আবুল বাসার
উচ্চ মাধ্যমিক : অরুণ কুমার সেন
ব্যাচেলর : দেবদুলাল দাস
ব্যাচেলর : গৌতম ব্যানার্জী
উচ্চ মাধ্যমিক : মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
ব্যাচেলর : পীযুষ কান্তি রায়
ব্যাচেলর : সুব্রত কুমার চৌধুরী
ব্যাচেলর : অনন্ত ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ মোতিউর রহমান
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ তোজাম্মল হক
ব্যাচেলর : মিলন কুমার সাহা
ব্যাচেলর : নিরঞ্জন সাঁতরা
ব্যাচেলর : মিনহাজুদ্দিন আহমেদ
ব্যাচেলর : সুকুমার মুখার্জী

১৯৮৪

ব্যাচেলর : হরনাথ ঘোষ
ব্যাচেলর : অনিল কুমার মণ্ডল
ব্যাচেলর : পরেশনাথ ঘোষ
উচ্চ মাধ্যমিক : সাগর কুমার দাস
ব্যাচেলর : পলাশ ব্যানার্জী
ব্যাচেলর : এক্রামুল হক
ব্যাচেলর : মলয় পাল
ব্যাচেলর : মানিক চন্দ্র দে
ব্যাচেলর : সাদেক আলী বিশ্বাস
ব্যাচেলর : কল্যাণ মিত্র
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ ঈশা
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ কামিরুদ্দিন

১৯৮৫

ব্যাচেলর : ধনঞ্জয় মণ্ডল
ব্যাচেলর : মানব যশ
ব্যাচেলর : প্রণব দেবনাথ
ব্যাচেলর : দীপক দত্ত
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ আব্দুল খালেক
ব্যাচেলর : শিবাশিস মণ্ডল
ব্যাচেলর : দিবাকর বর্মন
ব্যাচেলর : লক্ষ্মণ চন্দ্র সাহা
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ আশাদুরজামান
ব্যাচেলর : প্রশান্ত ঘোষ
ব্যাচেলর : কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

১৯৮৬

ব্যাচেলর : অজিত সরকার
ব্যাচেলর : বিজয় কুমার মণ্ডল
ব্যাচেলর : পার্থ সারথি দফাদার
ব্যাচেলর : প্রবীর কুমার পাল
ব্যাচেলর : প্রসূন কুমার ঘোষ
ব্যাচেলর : শৈলজা ব্যানার্জী
ব্যাচেলর : তাপস ঘোষ
ব্যাচেলর : তুষার গড়াই
ব্যাচেলর : অনুপ কুমার মণ্ডল
ব্যাচেলর : দীপক কুমার দাস
ব্যাচেলর : কিরীটি ব্যানার্জী
ব্যাচেলর : সজল কুমার ঘোষ
ব্যাচেলর : অরূপ কুমার দত্ত
ব্যাচেলর : বিবেকব্রত ঘোষ
ব্যাচেলর : তাপস কুমার কুণ্ডু
ব্যাচেলর : গৌতম চন্দ
ব্যাচেলর : প্রবীর কুমার পাল
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ সাদউদ্দীন
ব্যাচেলর : মনোরঞ্জন ঘোষ
ব্যাচেলর : গদাধর দাস

১৯৮৭

ব্যাচেলর : করুণাময় দাস
ব্যাচেলর : অজয় কুমার চক্রবর্তী
ব্যাচেলর : সন্দীপ দাস
ব্যাচেলর : সুজয় কুমার দাস

ব্যাচেলর : আকাশ ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : স্বপন গোস্বামী
ব্যাচেলর : জয়দীপ মণ্ডল
ব্যাচেলর : পার্থ সারথি দফাদার
ব্যাচেলর : অমল দত্ত
ব্যাচেলর : তাপস কুমার মিত্র

১৯৮৮

ব্যাচেলর : অপূর্ব কুমার ঘোষ
ব্যাচেলর : কৌশিক ঘোষ
ব্যাচেলর : সুব্রত ঘোষ
ব্যাচেলর : তাপস ভট্টাচার্য
উচ্চ মাধ্যমিক : আলোক মণ্ডল
ব্যাচেলর : প্রদীপ্ত মজুমদার
ব্যাচেলর : রামপ্রসাদ দাস
ব্যাচেলর : তুষার মণ্ডল
ব্যাচেলর : অমিত মজুমদার
ব্যাচেলর : ইজাজুল হক
ব্যাচেলর : গৌতম পাল
ব্যাচেলর : কেশব চন্দ্র মণ্ডল
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ ফয়জুল করিম
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ হিদেয়াতুল্লা
ব্যাচেলর : জয়ন্ত মণ্ডল

১৯৮৯

ব্যাচেলর : বিপ্লব কুমার দত্ত
ব্যাচেলর : গোপীনাথ সাহা
ব্যাচেলর : বিপ্লবজিৎ ঘোষ
ব্যাচেলর : দেবরাজ ব্যানার্জী
ব্যাচেলর : মহিবুল ইসলাম
ব্যাচেলর : রবীন্দ্রনাথ দাস
ব্যাচেলর : পার্থ সারথী দাস
ব্যাচেলর : রাজেন্দ্র কুমার দে
ব্যাচেলর : অমিত্রসূদন চৌধুরী
ব্যাচেলর : সিদ্ধার্থ ঘোষ

১৯৯০

ব্যাচেলর : বিনোদ বিহারী সরকার
উচ্চ মাধ্যমিক : শামিম কবীর
ব্যাচেলর : ওয়াশিমুল বারি
ব্যাচেলর : বসন্ত মণ্ডল
ব্যাচেলর : পিনাকি রঞ্জন কুমার
ব্যাচেলর : মতিউর রহমান সেখ

১৯৯১

ব্যাচেলর : শিবদাস গড়াই
ব্যাচেলর : অর্জুন মণ্ডল
ব্যাচেলর : বৃন্দাবন দাস
ব্যাচেলর : হলধর মণ্ডল
ব্যাচেলর : হেমন্ত পাল
ব্যাচেলর : সঞ্জয় কর্মকার

১৯৯২

ব্যাচেলর : হিফজুর রহমান
ব্যাচেলর : হীরালাল চন্দ্র
ব্যাচেলর : সুজিত কুমার দাস
ব্যাচেলর : যতীন্দ্র ঘোষ
ব্যাচেলর : প্রদীপ্ত চৌধুরী
ব্যাচেলর : তাপস সাহা
ব্যাচেলর : বিকাশ গুপ্তা
ব্যাচেলর : মোশারফ হোসেন
ব্যাচেলর : প্রিয়রঞ্জন গাঙ্গুলি
ব্যাচেলর : আসিফ মোহাম্মদ ইকবাল

১৯৯৩

ব্যাচেলর : অনিমেষ মণ্ডল
ব্যাচেলর : আসিত দত্ত
ব্যাচেলর : বিকাশ গড়াই
ব্যাচেলর : সুব্রত মণ্ডল
ব্যাচেলর : বিমল চৌধুরী
ব্যাচেলর : বিমল কুমার পাল
ব্যাচেলর : সুনির্মল সাহা
ব্যাচেলর : আশিস সেন
ব্যাচেলর : সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলি
ব্যাচেলর : তুহিন দে

ব্যাচেলর : সুমন চক্রবর্তী
ব্যাচেলর : আনন্দ মণ্ডল
ব্যাচেলর : ওয়াকুল আহমেদ
ব্যাচেলর : বাবলু মণ্ডল
ব্যাচেলর : হৃদয় মণ্ডল
ব্যাচেলর : কালীশঙ্কর রায়
ব্যাচেলর : রফিকুল ইসলাম
ব্যাচেলর : সব্যসাচী রায়
ব্যাচেলর : সুভাষ চক্রবর্তী
ব্যাচেলর : শেখর মজুমদার

১৯৯৪

ব্যাচেলর : অনিরুদ্ধ দাস
ব্যাচেলর : আনসারুল হক
ব্যাচেলর : অরিন্দম চ্যাটার্জী
ব্যাচেলর : প্রিয়রঞ্জন রায়
ব্যাচেলর : তুষার মণ্ডল
ব্যাচেলর : পলাশ সিনহা
ব্যাচেলর : কাজল চক্রবর্তী
ব্যাচেলর : কুণালকান্তি সিংহরায়
ব্যাচেলর : পার্থ প্রামানিক
ব্যাচেলর : রাজেশ কুমার দাস
ব্যাচেলর : রিপন মণ্ডল
ব্যাচেলর : চন্দন বিশ্বাস
ব্যাচেলর : দেবাশিস ঘোষ
ব্যাচেলর : কুমার দেব বিশ্বাস
ব্যাচেলর : মহীউদ্দিন আহমেদ
ব্যাচেলর : নির্মলেন্দু বিশ্বাস
ব্যাচেলর : উদয়ন পাল
ব্যাচেলর : বিপত্তারণ ভুঁইমালি
ব্যাচেলর : প্রবোধ মণ্ডল
ব্যাচেলর : সেমিম সিদ্দিক
ব্যাচেলর : গৌতম মণ্ডল
ব্যাচেলর : রাজকুমার ঘোষ
ব্যাচেলর : তাপস সাহা

১৯৯৫

ব্যাচেলর : অর্ণব চন্দ
ব্যাচেলর : মৃণালকান্তি মণ্ডল
ব্যাচেলর : বিধান সরকার
ব্যাচেলর : বুবুল সরকার
ব্যাচেলর : কমলেশ ঘোষ
ব্যাচেলর : পিনাকিরঞ্জন ঘোষ
ব্যাচেলর : সোমনাথ ঘটক
ব্যাচেলর : সুরজিৎ রায়
ব্যাচেলর : তরুন সাহা
ব্যাচেলর : আওলাদ হোসেন
ব্যাচেলর : অনিন্দ্য দত্ত
ব্যাচেলর : মানস বিশ্বাস
ব্যাচেলর : উমাশঙ্কর রায়
ব্যাচেলর : উদয়ন মণ্ডল
ব্যাচেলর : মানস কুমার গড়াই
ব্যাচেলর : মনোজিৎ লাহা
ব্যাচেলর : পৃথ্বীশ দাস
ব্যাচেলর : ওয়াকিফ মোহাম্মদ সাহিন
ব্যাচেলর : আরিফুজ্জামান মোল্লা
ব্যাচেলর : অমর মণ্ডল
ব্যাচেলর : মহঃ সামিম
ব্যাচেলর : নয়ন মণ্ডল

১৯৯৬

ব্যাচেলর : আবু তাহের মাসুম রাজা
ব্যাচেলর : জয়ন্ত ধর
ব্যাচেলর : সুধাকৃষ্ণ মণ্ডল
ব্যাচেলর : সুদীপ গড়াই
ব্যাচেলর : আশুতোষ দাস
ব্যাচেলর : রাজদীপ ঘোষ
ব্যাচেলর : অনিরুদ্ধ বিশ্বাস
ব্যাচেলর : নুরুল আলম
ব্যাচেলর : অরুণ হালদার
ব্যাচেলর : প্রদ্যুৎ চৌধুরী
ব্যাচেলর : বাপ্পাদিত্য প্রামানিক
ব্যাচেলর : তুষার মণ্ডল
ব্যাচেলর : উজ্জ্বল সাহা

১৯৯৭

ব্যাচেলর : বিশ্বজিৎ সাহা
ব্যাচেলর : দেবকীনন্দন মাজি
ব্যাচেলর : হিমাদ্রি ঘোষ
ব্যাচেলর : কৌশিক সিনহা
ব্যাচেলর : কৃষ্ণদাস লায়েক
ব্যাচেলর : মলয় দাস
ব্যাচেলর : মানবেন্দ্র রায়
ব্যাচেলর : মেহেবুব ফারুক আহমেদ
ব্যাচেলর : মৃদুল হক
ব্যাচেলর : মুক্তার আলম
ব্যাচেলর : নূর আলি
ব্যাচেলর : শহীদুল হক
ব্যাচেলর : শুভেন্দু মণ্ডল (ইংরাজি)
ব্যাচেলর : শুভেন্দু মণ্ডল (গণিত)
ব্যাচেলর : সুকান্ত পাল
ব্যাচেলর : স্বপন বাগদী
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক
ব্যাচেলর : প্রণব সাহু
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ নূর আলি
ব্যাচেলর : ভবানীপ্রসাদ দাস
ব্যাচেলর : জামিল আখতার
ব্যাচেলর : প্রভাকর সরকার
ব্যাচেলর : কৌশিক সিনহা
ব্যাচেলর : অরূপ মিশ্র
ব্যাচেলর : সন্তোষ কাপুড়ি
ব্যাচেলর : শুকুরুদ্দিন মল্লিক

১৯৯৮

ব্যাচেলর : আমিত কুমার দাস
ব্যাচেলর : দীপায়ন দে
ব্যাচেলর : হিমাংশু ঘোষ
ব্যাচেলর : রাকেশ ভকত
ব্যাচেলর : সুশান্ত দাস
ব্যাচেলর : অপূর্ব ঘোষ
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন
ব্যাচেলর : হরেকৃষ্ণ মণ্ডল
ব্যাচেলর : সোমপ্রকাশ মুখার্জী
ব্যাচেলর : শ্রীমন্ত ঘোষ
ব্যাচেলর : তারকনাথ মণ্ডল

১৯৯৯

ব্যাচেলর : জয়ন্ত ঘোষ
ব্যাচেলর : বরুণ ঘোষ
ব্যাচেলর : রুদ্রপ্রতাপ মুখার্জী
ব্যাচেলর : মৃন্ময় রায়
ব্যাচেলর : সুমিত মণ্ডল
ব্যাচেলর : আব্দুল কাদের
ব্যাচেলর : আজিম শেখ
ব্যাচেলর : আহাসান হাবিব
ব্যাচেলর : শ্যামল সাহা
ব্যাচেলর : গোলাম মুর্তুজা
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ নাসিমুদ্দিন

২০০০

ব্যাচেলর : গিরিধারী দাস
ব্যাচেলর : মুরারী কৃষ্ণ সাহা
ব্যাচেলর : অরবিন্দ শী
ব্যাচেলর : দেবব্রত ঘোষ
ব্যাচেলর : গোলাম আম্বিয়া
ব্যাচেলর : রাজেশ ঘোষ
ব্যাচেলর : তপেশ পাল
ব্যাচেলর : সৌমেন দে

২০০১

ব্যাচেলর : কালীকিঙ্কর মণ্ডল
ব্যাচেলর : অরূপ শী
ব্যাচেলর : দিব্যেন্দু মণ্ডল
ব্যাচেলর : পিন্টু মুখার্জী
ব্যাচেলর : কার্তিক দাস
ব্যাচেলর : বিশ্বজিৎ দে
ব্যাচেলর : আবির সেন
ব্যাচেলর : ভাস্কর মণ্ডল
ব্যাচেলর : হিদেয়াতুল্লা মণ্ডল

ব্যাচেলর : রাজেন মণ্ডল
ব্যাচেলর : নীলোৎপল বাগদী

২০০২
ব্যাচেলর : কাঞ্চন ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : সুব্রত কুমার সাহা
ব্যাচেলর : রঞ্জিত কুমার সেন
ব্যাচেলর : সুশোভন ঘোষ
ব্যাচেলর : মইদুল ইসলাম
ব্যাচেলর : সন্দীপ গোলদার
ব্যাচেলর : চন্দন সরকার
ব্যাচেলর : পার্থ মণ্ডল
ব্যাচেলর : বাহলুল হক
ব্যাচেলর : হাসানুজ্জামান
ব্যাচেলর : আমজাদ হোসেন

২০০৩
ব্যাচেলর : অর্পণ মুখার্জী
ব্যাচেলর : জাহাঙ্গীর হোসেন
ব্যাচেলর : কৃষ্ণচন্দ্র ধীবর
ব্যাচেলর : অনন্ত মণ্ডল

২০০৪
ব্যাচেলর : কৌশিক ভট্টাচার্য
ব্যাচেলর : বিষ্ণুচরণ পাল
ব্যাচেলর : অমর গুপ্ত
ব্যাচেলর : পার্থ সারথি পাল
ব্যাচেলর : মোহাম্মদ সামিম রেজা
ব্যাচেলর : আবদুল আজিজ আল আমন
ব্যাচেলর : সুরেশ কুমার পাল
ব্যাচেলর : জীবন কুমার সরকার
ব্যাচেলর : জীবন কুমার পাল
ব্যাচেলর : আদিত্য দে
ব্যাচেলর : অশোক কোনাই
ব্যাচেলর : সন্দীপ মণ্ডল
ব্যাচেলর : বিদ্যুৎ পাল
ব্যাচেলর : প্রভাস চন্দ্র দে

২০০৫
ব্যাচেলর : উত্তম ঘোষ
ব্যাচেলর : জীবনানন্দ ভট্টাচার্য

২০০৬
ব্যাচেলর : লক্ষণ সরেন
ব্যাচেলর : সুব্রত থান্ডার
ব্যাচেলর : শান্তনু সরকার
ব্যাচেলর : এজাহার আলম
ব্যাচেলর : বাপি নূর
ব্যাচেলর : দেবব্রত মণ্ডল
ব্যাচেলর : রাহুল মণ্ডল
ব্যাচেলর : শুভেন্দু মণ্ডল
ব্যাচেলর : ইন্দ্রজিৎ নন্দী

২০০৭
ব্যাচেলর : মোতাহার হোসেন মোল্লা
ব্যাচেলর : নিরঞ্জন পাল

২০০৮
ব্যাচেলর : কেশব মণ্ডল
ব্যাচেলর : সফিক আহমেদ

২০০৯
ব্যাচেলর : ইন্দ্রজিৎ লেট

২০১০
ব্যাচেলর : তাপস মণ্ডল
ব্যাচেলর : বুদ্ধদেব সাহা

২০১৫
ব্যাচেলর : রাধাশ্যাম দাস

প্রাক্তনী দাদা, ভাই, বন্ধুদের সম্পর্কে বিস্তারিত
জানতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখো :
http://www.satyanandachhatrabas.org

SWAGAT
CARING YOUR JOURNEY...

ANDAMAN SWAGAT

Santiniketan

Andaman

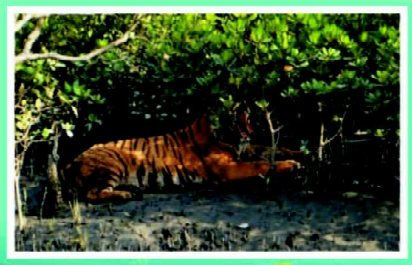

Sundarban

Andaman Holiday Packages / Bengal Packages
Water Sports | Scuba Diving | Snorkeling | Game Fishing
Sea Walking | Luxury Cruise | Hotel & Resort | Car
Honeymoon Trip | Educational Tour | Corporate Tour
B2B Operations

SWAGAT GROUP
HATORA, SAINTHIA, BIRBHUM, WB- 731234
Kol. Office: Nalta School Lane,
Dumdum Cant, Kolkata - 28
Mob- 9932330055/9933290590
swagatgroups@gmail.com

ANDAMAN SWAGAT
DOLLYGUNJ, PORT BLAIR, ANDAMAN.
Mob- 9476028789
andamanswagat@gmail.com
www.andamanswagat.com

সৌজন্যে : **সুকান্ত পাল** (প্রবেশ : ১৯৯৭)

প্রিয় ভাই, বন্ধু ও শ্রদ্ধেয় দাদা,

এবছর পুনর্মিলনী উৎসব - এর অন্যতম আকর্ষণ এই "আনন্দদীপ" । এই সুন্দর উদ্যোগের জন্য পুনর্মিলনী উৎসব -এর পরিচালন কমিটি, পত্রিকা কমিটি এবং "আনন্দদীপ" – কে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেককে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের একজন প্রাক্তন হিসাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই।

আমি বিগত প্রায় 16 বছর ধরে সমস্ত রকমের ইন্সুরেন্স -এর একজন এজেন্ট ও পরামর্শ দাতা হিসাবে সফলতার সাথে কাজ করে আসছি।

জীবন বিমা – শুধুমাত্র লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

স্বাস্থ্য বীমা – শুধুমাত্র স্টার হেল্‌থ

এছারাও সমস্ত ধরনের (দু' চাকা, চার চাকা, ডাম্পার, কমার্শিয়াল গাড়ী, মালবাহী গাড়ী, ভ্যান, ট্রাক্টর, বাস, ট্রাক ইত্যাদী) গাড়ী, বাড়ী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকান, গ্রুপ ইন্সুরেন্স, গবাদী পশু, পশু ফার্ম – সহ প্রায় সবকিছুরই ইন্সুরেন্স অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে করে থাকি।

উপরোক্ত সমস্ত পরিষেবা আপনি আপনার বাড়িতে থেকেই পেয়ে যাবেন। প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করুন এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যান..... +91 -9434492174 / 7001272774 (অফিস) ।

ধন্যবাদান্তে,

Giridhari Das (EY 2000, B.Com -H)

পুনর্মিলন উৎসবের দিনগুলি

প্রথম ১ জুলাই ২০১৮, সানাই লজ

দ্বিতীয় ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯, ছুটি হোটেল

তৃতীয় ১২ জুন, ২০২২, সাঁইথিয়া কমিউনিটি হল

চতুর্থ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণ

The Stars of Re-union Cup

স্বামী সত্যানন্দ দেব

ANANDADEEP, A Literary Magazine
PUBLISHED BY THE EX-BOARDERS OF SATYANANDA CHHATRABAS, SAINTHIA, BIRBHUM

প্রকাশক সত্যানন্দ ছাত্রাবাস প্রাক্তনীবৃন্দের কার্যকরী সমিতির পক্ষে সভাপতি মহঃ মোস্তফা কামাল।। সম্পাদক বুবুল সরকার
মুদ্রক সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, পূর্ব বর্ধমান।। অনুদান ১০০ টাকা